সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ
সংখ্যা: ০৭-০৮
২৪ নভেম্বর ২০২৫, সোমবার

ইবনে তুলুন মসজিদ, কায়রো, মিশর

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا–١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	‘আসর	মাগরিব	‘ইশা
০১.১২.২৫	০৫:০৫	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০২.১২.২৫	০৫:০৫	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৩.১২.২৫	০৫:০৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৪.১২.২৫	০৫:০৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৫.১২.২৫	০৫:০৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৬.১২.২৫	০৫:০৮	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৭.১২.২৫	০৫:০৮	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৮.১২.২৫	০৫:০৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩৩
০৯.১২.২৫	০৫:১০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১০.১২.২৫	০৫:১০	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৩
১১.১২.২৫	০৫:১১	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১২.১২.২৫	০৫:১১	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৩.১২.২৫	০৫:১২	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৪.১২.২৫	০৫:১২	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫
১৫.১২.২৫	০৫:১৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৬.১২.২৫	০৫:১৩	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৭.১২.২৫	০৫:১৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৮.১২.২৫	০৫:১৫	১১:৫৫	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৬
১৯.১২.২৫	০৫:১৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৭
২০.১২.২৫	০৫:১৬	১১:৫৬	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২১.১২.২৫	০৫:১৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৮
২২.১২.২৫	০৫:১৭	১১:৫৭	০২:৫৮	০৫:১৮	০৬:৩৮
২৩.১২.২৫	০৫:১৭	১১:৫৮	০২:৫৯	০৫:১৮	০৬:৩৯
২৪.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৮	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৫.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৪০
২৬.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৯	০৩:০০	০৫:২০	০৬:৪১
২৭.১২.২৫	০৫:১৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৪১
২৮.১২.২৫	০৫:১৯	১২:০০	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
২৯.১২.২৫	০৫:২০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪২
৩০.১২.২৫	০৫:২০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪৩
৩১.১২.২৫	০৫:২০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৫:৪৩

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

সূচীপত্র

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

০৭-০৮ সংখ্যা
২৪ নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী
০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০২ জমাদিউস্ সানি ১৪৪৭ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ) ●

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

✍ সম্পাদকীয় ০৩
◈ **আল কুরআনুল হাকীম : ❖ অপরাধীদের জবানবন্দী : কেন তারা আজ এ ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন!**
✍ আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
◈ **হাদীসে রাসূল ﷺ : ❖ নবী (ﷺ)-এর তিনটি অসিয়্যাত**
✍ গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
◈ **প্রবন্ধ : ❖ প্রসঙ্গ : বৈধ উপার্জন** ✍ আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
❖ **দু'আ কবুলের সুন্নাহনির্ভর পদ্ধতি** ✍ আবু ফাইয়ায- ১৫
❖ **নববী দু'আ : এক অনন্য সৌভাগ্যের পরশ**
✍ মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী- ১৯
❖ **ইসলামী সাহিত্যতত্ত্বে শিশুসাহিত্য**
✍ মূল : ড. ইবরাহিম নুওয়াইরি, ভাষান্তর : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ২২
❖ **দাফন ও দাফনের পর করণীয়** ✍ জান্নাতুল মহল- ২৬
◈ **ক্বাসাসুল হাদীস : ❖ 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রযিয়াল্লা-হু আনহু)'র তিন প্রশ্ন ও ইসলাম গ্রহণ** ✍ আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৯
◈ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা : ❖ বাংলাদেশ ও ভূমিকম্প** ✍ ফয়সাল আহমেদ- ৩০
◈ **সমাজচিন্তা : ❖ পরিবারের কাঠামো : একক বনাম যৌথ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা** ✍ মুহাম্মদ আব্দুল হাই- ৩২
◈ **ইতিহাস : ❖ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক চিহ্ন ওয়্যার সিমেট্রি**
✍ মো. কায়ছার আলী- ৩৬
◈ **নিভৃত ভাবনা : ❖ আকসার ঐ আবাবিল** ✍ সুপ্ত রায়হান সজিব- ৩৮
✍ কবিতা ৪১
✍ জমঈয়ত সংবাদ ৪২
✍ শুব্বান সংবাদ ৪৫
✍ স্বাস্থ্য-সচেতনতা ৪৬
✍ ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৭
✍ প্রচ্ছদ রচনা ৪৮

যোগাযোগ
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ ব্যবস্থাপক: ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিপণন: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১ weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com
Page: f/shaptahikArafat, f/groups/weeklyarafat

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ) বাংলাদেশ : (বার্ষিক : ৭০০/- ষান্মাসিক : ৩৫০/-) মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

মণিরখনি

আল্লাহ তা'আলার বাণী

❁ ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ﴾

“হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের রবকে; (জেনে রেখ) কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশু থেকে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।” *(সূরা আল-হাজ্জ : ১-২)*

❁ ﴿اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا﴾

“পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে আর মানুষ বলবে– এর কি হলো? সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।” *(সূরা আয্-যিলযাল : ১-৪)*

❁ ﴿اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ﴾

“মহা প্রলয়। মহা প্রলয় কী? মহা প্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জানো? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গের মতো এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মতো।” *(সূরা আল-ক্বা-রি'আহ্ : ১-৫)*

❁ ﴿وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ﴾

“আর তুমি পাহাড়সমূকে স্থির মনে করছ। অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে। (এটা) আল্লাহর কাজ, যিনি সব কিছু দৃঢ় করেছেন। তোমরা যা করো, নিশ্চয় তিনি সে সম্পর্কে অবহিত।” *(সূরা আন্-নামল : ৮৮)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمْ الْمَالُ فَيَفِيْضَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, খুনখারাবি বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে তা উপচে পড়বে।’ *(সহীহুল বুখারী- হা. ১০৩৬)*

❁ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ﷺ) قَالَ "فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ "إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ".

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘এ উম্মতের মাঝে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষনের শাস্তি নেমে আসবে। মুসলিমদের এক লোক বলল : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কখন এটা ঘটবে? তিনি বললেন : যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ ঘটবে এবং মদ্যপানের সয়লাব হবে।’ *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২২১২; সহীহাহ্- আলবানী, হা. ২২০৩)*

❁ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ﷺ) : «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

নবীজি (ﷺ) বলেছেন, ‘যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমানত কিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি বললেন, যখন কোনো অযোগ্য ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।’ *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৯৬)*

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ধর্মীয় বিতর্ক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ

বাংলাদেশের সামাজিক-ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সম্প্রতি তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে– কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্ক, বাউল ঐতিহ্যকে ঘিরে নতুন বিতর্ক এবং কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে হাদীস অস্বীকারের প্রবণতা। এ ইস্যুগুলো ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে উদ্ভূত হলেও একটি মূল প্রশ্নে এসে মিলিত হয়। প্রশ্নটি হলো– ধর্মীয় মতপার্থক্য আমরা কীভাবে সামলাব?

বাংলাদেশের সমাজ ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে আবেগ, ভুল তথ্য এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রায়ই যুক্তি, সংলাপ এবং সত্য অনুসন্ধানকে সরিয়ে দিচ্ছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিয়ে দেশে সময় সময় উত্তেজনা তৈরি হয়। কারণ তারা ‘আহমদিয়া মুসলিম’ নিয়ে সাধারণ মুসলিমদেরকে নানা কৌশলে বিভ্রান্ত করছে। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পরিবর্তে তারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে। আর এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তারা নতুন এক ধর্মের জন্ম দিয়েছে, যার সাথে দীন ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সব ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় তাদেরও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তাদের মূল পরিচয়টা ‘মুসলিম’ নয়, ‘অমুসলিম’ থাকা দরকার, অন্যান্য মুসলিম দেশে যেমন রয়েছে। খতমে নবুওয়াত সম্মেলনেরও এটাই দাবি। আর এ উদ্যোগটা সরকারকেই নিতে হবে। নতুবা এ বিতর্ক, বিভ্রান্তি কিংবা অসহিষ্ণুতা চলতেই থাকবে।

বাউল ঐতিহ্য বাংলাদেশের সেকিউলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাউলদের কিছু বক্তব্য, গান বা আচারকে কেন্দ্র করে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কারণ তাদের উপস্থাপনায় ইসলামী পরিভাষা ব্যবহৃত হলেও তা চরম পর্যায়ের শির্ক এবং বিদ‘আত মিশ্রিত। তারা মূলত হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং সুফীবাদের সমন্বয়ে সম্রাট আকবরের ‘দীন-ই-ইলাহী’-র মতো ভিন্ন এক জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করে যাকে ‘লালন ধর্ম’ বলা যেতে পারে। ইতোমধ্যে তাদের এক শিল্পী আবুল সরকার গ্রেপ্তার হওয়ায় তাদের অদ্ভুত এবং আপত্তিকর জীবনাচারের বিভিন্ন তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ধর্ম অবমাননার বিষয়টি উপেক্ষা করার মতো নয়। এ বিষয়েও সরকারের পক্ষ থেকে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

ধর্মীয় বিকৃতির আরও দু’টি ধারা আমাদের দেশে সক্রিয় রয়েছে– এক হলো হিজবুত তাওহীদ, অপরটি হলো ‘আহলে কুরআন’ নামে পরিচিত হাদীস অস্বীকারকারী নব্য খারেজী দল। এরা নিজেদেরকে ‘তাওহীদী জনতা’ দাবি করলেও সমাজে ধর্মীয় উগ্রতা এবং ভিন্ন ধারা সৃষ্টিতে এরা বেশ অগ্রসর।

উল্লিখিত প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের শক্তি। এ শক্তিকে দৃঢ় রাখতে হলে ধর্ম অবমাননামূলক বক্তব্য, আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান-‘আক্বিদার বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দুঃসাহসী উচ্চারণ, ধর্মীয় বিকৃতিকে সমর্থন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আরও প্রয়োজন দায়িত্বশীল ধর্মীয় নেতৃত্ব, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, অনলাইন ও অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই সংযত ভাষা ব্যবহার, ভিন্নমতের মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ধর্মীয় জ্ঞানকে গবেষণাপূর্ণ এবং প্রমাণসম্মতভাবে উপস্থাপন। আর এ কাজটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিকল্প নেই। ☒

আল কুরআনুল হাকীম

অপরাধীদের জবানবন্দী : কেন তারা আজ এ ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন!

–আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ[★]

আল্লাহ তা‘আলার অমিয় বাণী

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَ لَمْ نَكُ
نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ وَ كُنَّا
نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰٓى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

“(সেদিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবে–) কিসে তোমাদেরকে সাক্বার (অর্থাৎ- জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? (উত্তরে) তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান করতাম না। আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে (সত্য পথের পথিকদের) সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে (এ অবস্থায়) আমাদের কাছে মৃত্যু চলে আসে।”[১]

শাব্দিক অনুবাদ

مَا -(এটি একটি প্রশ্নবোধক শব্দ) অর্থ- কিসে? سَلَكَكُمْ -তোমাদেরকে এখানে এনেছে, فِيْ -(কোনো স্থান/কোনো সময়ের) মধ্যে, سَقَرَ -এটি জাহান্নামের একটি স্তর/নাম, قَالُوْا -তারা বললো, لَمْ نَكُ -আমরা ছিলাম না, مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -মুসল্লীদের/নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত, وَ -এবং, لَمْ نَكُ نُطْعِمُ -আমরা খাওয়াই নাই, الْمِسْكِيْنَ - অভাবগ্রস্ত, হৃতসর্বস্ব, (পরিভাষায়– মিসকিন হলো এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার নিজের ব্যয় নির্বাহ করার মতো কিছুই নেই। সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই), وَ - এবং, كُنَّا -আমরা ছিলাম, نَخُوْضُ -আমরা সমালোচনা করতাম, مَعَ -সাথে থেকে, الْخَآئِضِيْنَ -যারা সমালোচনাকারী, وَ كُنَّا نُكَذِّبُ -এবং আমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, بِيَوْمِ الدِّيْنِ -প্রতিদান দিবসকে, حَتّٰٓى - এ সময় পর্যন্ত, اَتٰنَا -আমরা এসেছি, الْيَقِيْنُ -নিশ্চয়তা (এখানে এর অর্থ হবে– নিশ্চিত মৃত্যু)।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দরসে উল্লেখিত আয়াত ছয়টি কুরআনুল কারীমের ৭৪ নং সূরা– সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরের বিয়াল্লিশ (৪২) থেকে সাতচল্লিশ (৪৭) নম্বর আয়াত।

শানে নুযুল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল বা অবতরণের বিশেষ কোনো কারণ নেই, তবে এগুলো মক্কী যুগে নাযিল হওয়া সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরের অংশ। সূরা মুদ্দাস্‌সির ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় অবতীর্ন হয়। সাধারণত এ আয়াতগুলোতে জাহান্নামীরা কেন জাহান্নামে শাস্তির সম্মুখীন তার বর্ণনা দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে এ অপরাধসমূহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে জাহান্নামীদের চারটি অপরাধের বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। **এক-** নামায পরিত্যাগ, **দুই-** অভাবগ্রস্তদের খাদ্য না দেয়া, **তিন-** সমালোচকদের সাথে মিশে পুণ্যবানদের সমালোচনা করা ও **চার-** প্রতিফলদিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

জান্নাতীদের সংলাপ ও অপরাধীদের জবানবন্দী : পূর্ববর্তী দু’টি আয়াতের দিকে তাকালেই দেখা যায় সেখানে জান্নাতীদের পারস্পরিক একটি সংলাপের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন,

﴿فِيْ جَنّٰتٍ ۚ يَتَسَآءَلُوْنَ﴾

অর্থ- “জান্নাতে (জান্নাতীগণ) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে।”

[★] এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির : আয়াত নং- ৪২-৪৭।

তাদের সেই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়বস্তু কি হবে? তাও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ﴾

অর্থ- "তারা পরস্পপর জিজ্ঞাসা করবে অপরাধীদের সম্পর্কে" এবং তারা জানতে চাইবে কোন অপরাধে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ﴾

অর্থ- "(তারা জিজ্ঞাসা করবে) কিসে তোমাদেরকে সাক্বার (অর্থাৎ- জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে?" অপরাধীরা তখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে তাদের বড় বড় চারটি অপরাধের কথা বলবে। তাদের সেই চারটি অপরাধ বিস্তারিতভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

এক- নামায পরিত্যাগ : এটাই হলো তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। তাই সে সময়ে তারা এই অপরাধের কথাই প্রথমেই উল্লেখ করবে। তারা বলবে–

﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴾

অর্থ- "আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।"

ইমাম কুরতুবী এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে– যেসব মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সালাত ঠিকমত আদায় করছে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।[২]

নামায হলো মহান আল্লাহর অধিকার। এই নামায পরিত্যাগ করা একটি কবিরা গুনাহ। এ গুনাহ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, তাওবায়ে খুলুসা ছাড়া তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। নামায পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে নবীজি (ﷺ) কঠোর হুশিয়ারী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

অর্থ- মানুষ (মুসলিম ও মু'মিন) এবং শির্ক-কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ করা।[৩]

তিনি আরো বলেন–

«اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

অর্থ- আমাদের (মুসলমানদের) ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো নামায। অতএব, যে নামায ছেড়ে দিলো সে কুফ্রী করল।[৪]

প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম নামায ব্যতীত আর কোনো 'আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফ্রী মনে করতেন না। 'উমার (রযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিলো ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।

উল্লেখিত ও অন্যান্য দলিলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফ্রীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে (নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি) নামায ফর্য হওয়াকে অস্বীকার করে না। আর এ মত পোষণ করেন ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন।

أَوَّلُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الْأَمَانَةُ وَآخِرُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْهُ الصَّلَاةُ.

অর্থ- সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তা হলো সলাত (নামায)।[৫]

সাউদি আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনে বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লা-হ)-সহ বর্তমান যুগে অনেক ওলামায়ে কেরাম নামায পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফ্রীর ফাতওয়া দিয়েছেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতে কোনোভাবেই এ নামায পরিত্যাগ করা যাবে না।

দুই- অভাবগ্রস্তদের খাদ্য না দেয়া : তারপর তারা তাদের আরো একটি অপরাধ উল্লেখ করে বলবে,

﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ﴾

"আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান করতাম না।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ও তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে– অভাবী মানুষকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া বা সাহায্য না করা মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার

---

[২] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং- ১৫০, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ১৩৪/৮২।*

[৪] *আত্ তিরমিযী- ই. ফা. বাং, ২৬২২, মা. শা., ২৬২১, সহীহ।*

[৫] *ইমাম বাইহাকী (হা. ১২৬৯৬, ১৩০৭১) হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমান (৪/৩২৫, হা. ৪৮৯১)-এ উল্লেখ করেছেন।*

কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ। আর যে ব্যক্তি শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবীকে খাদ্য খাওয়াবে তার এ 'আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে উপদেশ দিলেন তাতে বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوْا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، (وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ) وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

অর্থ- হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রচলন করো, খাদ্য খাওয়াও (সুনান ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনায়– 'এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো') এবং যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন (রাতের গভীরে তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করো, তাহলেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬]

আলোচ্য হাদীসে খাবার খাওয়ানোর হুকুমটি ব্যাপক। খাবার খাওয়ানো দ্বারা যে কেবল ক্ষুধা নিবারণ হয় তাই নয়; বরং এটা পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসারও নিদর্শন। তাই এটা সকলের জন্যই অবারিত থাকা উচিত। ইসলামে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাবার খাওয়ানোর দ্বারা যেহেতু পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাই খাওয়ানোর ভেতর শুধু অভাবীদেরকেই নয়; বরং সকলকেই শরীক রাখা উচিত। অন্ন দান করা ব্যক্তির উদারতা ও বদান্যতারও পরিচায়ক। এটি একটি মহৎ গুণ। এগুণ ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক শিক্ষা। তাই অন্নদানকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যখন যাকে পাওয়া যায় তাকেই নিজ খাবারে শরীক রাখা উচিত। তাছাড়া অন্নদান করাটা সহমর্মিতারও প্রকাশ। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করাও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক শিক্ষা। তাই ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত, সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি যেই হোক না কেন। সে যদি অনাত্মীয়ও হয়, এমনকি অমুসলিমও যদি হয়, তবুও তার ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করা ঈমানের দাবি। শুধু মানুষকেই নয়; বরং পশু-পাখির ক্ষুধা নিবারণ করাও অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। কাকে কাকে খাওয়ানো হবে তা যেমন ব্যাপক, তেমনি কী খাওয়ানো হবে তাও ব্যাপক ও সাধারণভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ- এটা নির্ভর করে যে খাওয়াবে তার সামর্থ্যের উপর। সে যা পারবে তাই খাওয়াবে। খাওয়ানোর সাওয়াব পাওয়ার জন্য দামি খাবার খাওয়ানো বা মুখরোচক খাবার খাওয়ানোর শর্ত নেই। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যা খাওয়ানো হবে তাতেই সাওয়াব পাওয়া যাবে ইন্শা-আল্লাহ। খাবারের চেয়ে ব্যক্তির সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই বড়। আন্তরিকতাসহ সামান্য কিছুও যদি হাদিয়া হিসেবে দেয় পরম আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করা উচিত। নবী (ﷺ) বলেছেন,

«يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

অর্থ- হে মুসলিম নারীগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর জন্য তুচ্ছ মনে না করে, তা বকরির একটা পায়া হলেও।[৭]

সুতরাং সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে খাওয়াতে হবে। আর কারো হাদীয়া-তুহফা আগ্রহভরে গ্রহণ করতে হবে। যদি তা সামান্য কিছুও হয়।

তিন- সমালোচকদের সাথে মিশে পুণ্যবানদের সমালোচনা করা : এখানে তারা তাদের তৃতীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবে–

﴿وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।"

অসার তর্ক-বিতর্কে এবং ভ্রষ্টতার সমর্থনে তাদের কথাবার্তায় বড়ই উদ্যমের সাথে আমরা অংশ নিতাম। এটা যে কত বড় পাপ, তারা তখন তা উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু এই সময়ে উপলব্ধি করে তো কোনো লাভ হবে না। উপলব্ধি করার প্রয়োজন ছিল পার্থিব জীবনে। যখন তার 'আমল লিপিবদ্ধ হতো এবং যখন সে চাইলে তাওবাহ্ করতে পারতো। তখন তো সে তা

---

[৬] *ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার- অধ্যায় : ৪২, হা. ২৬৩৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৮৫, সহীহ।*

[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৬৬।*

করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। তারা ফিরে না আসায় তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ﴾

অর্থ- “অতএব যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও!”[৮]

অর্থাৎ- বাজে ও অনর্থক আলোচনায় মগ্ন থাকতে এবং নিজেদের দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকতে দাও। আর এদিকে তুমি তোমার প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখো। তাদের আচরণ যেন তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনে উদাসীন অথবা মনঃক্ষুণ্ন না করে। সুতরাং আজ চূড়ান্ত ফয়সালার দিন তারা তাদের জন্য জাহান্নামের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে থাকুক।

চার- প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা : এটা এমন একটা অপরাধ যা সরাসরি কুফ্‌রী। যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করে সে নিশ্চত কাফির। তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوْا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُوْنَ﴾

অর্থ- তারা বলে আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফ্‌রীর কারণে শাস্তি আস্বাদন করো।”[৯]

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা আরো বলেন–

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ ٱلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ ٱلدِّيْنِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ۞ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيْرُ ٱلْأَوَّلِيْنَ ۞ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوْا ٱلْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُوْنَ﴾

“সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, এটা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না; বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।”[১০]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- প্রতিটা মানুষের কর্মফল প্রদানের জন্যই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সদাসর্বদা পুণ্যের কাজ করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর এমন কাজ কিছুতেই করা যাবে না। যে কাজ মানুষকে জাহান্নামের শাস্তির মুখোমুখি করে।

দুই- জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই ভালো নামাযী হতে হবে। নামাযে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য পরকালে দুর্ভোগ রয়েছে।

তিন- জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য একটি সহজ ও ভালো ‘আমল হলো মানুষকে খাওয়ানো।

চার- কারো গীবত, সমালোচনা ও পরনিন্দা মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা একটি বড় পাপ যা মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে।

পাঁচ- দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয়, মৃত্যু পরবর্তী আরো একটি জীবন রয়েছে। পার্থিব জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে মৃত্যু পরবর্তী জীবন হলো চিরস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াই প্রত্যেকে মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ☒

---

[৮] *সূরা আল-মা‘আরিজ : ৪২।*

[৯] *সূরা আল-আন‘আম : ২৯-৩০।*

[১০] *সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন : ১০-১৭।*

সূচীপত্র

হাদীসে রাসূল ﷺ

নবী (ﷺ)-এর তিনটি অসিয়্যাত

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتّٰى أَمُوْتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু নবী (ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের অসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। (তা হলো–) **(১)** প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, **(২)** সালাতুয্-যুহা আদায় করা এবং **(৩)** বিতর (সালাত) আদায় করে শয়ন করা।[১১]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচয় : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র নামের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়াল ছানাটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে 'হে বিড়ালের পিতা!' (ইয়া আবূ হুরাইরাহ্) বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহর্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এখানে লক্ষণীয় হলো– এই 'আমলগুলো করার জন্য নবীজি অসিয়ত করেছেন। অসিয়ত সাধারণ কোনো কথা নয়; বরং তা মনের গভীর থেকে দেওয়া উপদেশ, যার বিশেষ গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য রয়েছে। আর এগুলো এমন অসিয়ত যা কখনও না ছাড়ার কথা বলেছেন মহানবী (ﷺ)। পরম আপনজনকে মানুষ অসিয়্যাত করে। নবীজির প্রিয় সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে তিনি অসিয়ত করেছেন। এখন আমরা দেখব উল্লেখিত তিনটি 'আমলের গুরুত্ব কী এবং কেন তিনি সারাজীবন সেগুলো পালন করতে বলেছেন।

(১) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা : প্রতি চন্দ্র মাসে তিনটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। দিনগুলো হলো আইয়ামুল বীয তথা প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫তম দিন। নবীজী (ﷺ) কখনো এ রোযাগুলো ছাড়তেন না। তিনি সব সময় আইয়ামে বীযের রোযা রাখতেন। এমনকি সফরেও। তবে রোযাগুলো ফযীলাতপূর্ণ হলেও তিনি উম্মতের জন্য এ রোযাকে

** প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৭৮; মুসলিম- ৬/১৩, হা. ৭২১।*

বাধ্যতামূলক করেননি। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেছেন–

"يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ".

অর্থ : হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করতে চাইলে তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে তা পালন করো।[১২]

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِيْ حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে ও সফরে কোথাও শুক্লপক্ষের দিনের সিয়াম ছাড়তেন না।[১৩]

আইয়ামে বীযের সিয়াম হলো চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে সিয়াম রাখা। এই দিনগুলোকে “আইয়ামে বীয” বলা হয়, যার অর্থ “উজ্জ্বল দিন”। চাঁদের পূর্ণতার কারণে এই দিনগুলোতে রাতগুলো বেশি আলোকিত হয়, তাই এগুলোকে এই নামে ডাকা হয়।

(২) সালাতুয্-যুহা আদায় করা : ইশরাকের সালাতের পরবর্তী সময়ের সালাতকে ‘যুহা’ বলা হয়। ‘যুহা’ একটা নতুন শব্দ যার অর্থ উজ্জ্বল সকাল বা প্রভাতে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। এই সময়টা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কুরআনুল কারীমের ৯৩তম সূরার নাম হলো সূরাতুয্ যুহা। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। যুহা এর সালাতকে পারস্য এবং আমাদের উপমহাদেশে চাশ্তের নামে পরিচিত। চাশ্ত মূলত একটি ফারসি শব্দ। এর আরবি শব্দ হলো, যুহা। ইরশাক শব্দটি আবরি হলেও চাশ্তের মতো এই শব্দটিও হাদীসে পাওয়া যায় না। তাছাড়া হাদীস গ্রন্থের শিরোনামে ইশরাক ও যুহার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের সকল নফল সালাতকে ‘সালাতুয যুহা’-এর সালাত বলে গণ্য হয়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ.

জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসার (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল দুহার বা চাশ্তের ওয়াক্ত। তিনি বললেন, দুই রাকআত সালাত আদায় করো। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। তিনি আমার ঋণ আদায় করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশি দিলেন।[১৪]

মুয়াজাহ আল আদাবিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা), কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (ﷺ) কি চাশ্তের বা দোহার সালাত আদায় করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চার রাকআত, আবার মহান আল্লাহর মর্জি হলে তার বেশিও পড়তেন।[১৫]

উম্মু হানি বিনতু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি ফতহে মক্কার বছর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানি বিনতু আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা, হে উম্মু হানি! গোসল শেষ করে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন। সালাত সমাধা করলে তাঁকে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সহোদর ভাই আলি (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। সে ব্যক্তিটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, হে উম্মু হানি! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মু হানি (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) বলেন, এ সময় ছিল চাশ্তের ওয়াক্ত।[১৬]

---

[১২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৭৬১; মিশকাত- হা. ২০৫৭; আন্ নাসায়ী- হা. ২৪২৪; সহীহ আল জামে’- হা. ৬৭৩।*

[১৩] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৪৫; হাদীস সম্ভার- হা. ১০৯৯; রিয়াযুস সালেহিন- হা. ১২৭২, সহীহ।*

[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৯৪।*

[১৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৮১।*

[১৬] *বুখারী- হা. ৩৫৭, ৩১৭১, ৪২৯২; মুসলিম- হা. ৩৩৬।*

সূচীপত্র

নু‘আইম ইবনু হাম্মার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাকআত সালাত হতে আমাকে ত্যাগ করো না, তাহলে আমি আখিরাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবো।[১৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : (فِي الْإِنْسَانِ ستون وثلاث مئة مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ) قَالُوْا : وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : (النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِيْ الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِنْ لم تجد فَرَكْعَتَا الضحى تجزيانك).

‘আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় রয়েছে। তার জন্য আবশ্যক হলো প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে সাদাক্বাহ্ করা।” তখন সাহাবীগণ বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এরকম করতে কে সক্ষম হবে?” জবাবে তিনি বলেন, “তুমি মসজিদে যে কফ-থুথু দেখতে পাও অতঃপর তা মাটিতে পুতে দাও অথবা রাস্তা থেকে কোনো (কষ্টদায়ক) জিনিস অপসারণ করো (এসব সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে) যদি তুমি এসব করতে না পাও, তবে চাশ্‌তের দুই রাকা‘আত সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।”[১৮]

(৩) বিতর (সালাত) আদায় করে শয়ন করা : হাদীসে এসেছে–

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ "إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

খারিজাহ্ ইবনু হুজাফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকটে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা একটি সালাত দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম আর তা হলো বিতরের সালাত। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য এটা ‘ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন।[১৯]

নবী (ﷺ) বিতর সালাত আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায়ের আদেশ করেছেন।[২০]

রাসূল (ﷺ) কখনো বিতর ছাড়েননি এমনকি সফরেও আদায় করতেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدٌ فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللهِ. قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

সা‘ঈদ ইবনু ইয়াসার (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমারের সাথে মক্কার পথ ধরে চলছিলাম। ভোর হয়ে যাচ্ছে মনে করে একসময় সওয়ারী থেকে নেমে বিতর সালাত আদায় করলাম এবং পরে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তিনি জানতে চাইলেন সওয়ার থেকে নেমে আমি কি করেছিলাম। বিত্‌র সলাত আদায় করেছি। এ কথা শুনে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার বললেন, রাসূলুল্লাহ

---

[১৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১২৮৯; আদ্ দারিমী- হা. ১৪৫১।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫৫৩; সুনান বাইহাক্বী- ২/২৯১; আত তায়ালিসী- হা. ৪৮৩; আহমাদ- ৫/১৭৮; আদাবুল মুফরাদ- ইমাম বুখারী, হা. ২৩০; আবূ আওয়ানা- ১/৪০৬; শরহুস সুন্নাহ- বাগাবী, ৪৮৯; মুশকিলুল আসার- তাহাবী, ৯৯।*

[১৯] *আত্ তিরমিযী- হা. ৪৫২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৬৮।*

[২০] *আত্ তিরমিযী- হা. ৪৫৫; আবূ দাঊদ- হা. ১১৮৭, সহীহ।*

(ﷺ)-এর জীবনে কি তোমার অনুসরণের জন্য উত্তম আদর্শ নেই। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তা অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, উটের পিঠে বসেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিতর সালাত আদায় করতেন।[২১]

বিতরের সালাত আদায় না করে ঘুমানোর অনুমতি রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ".

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতরের সালাত না আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন মনে হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম হতে উঠার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়া।[২২]

তবে শেষ রাতে যারা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেন তারা শেষ রাতেও বিতর পড়তে পারেন। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ".

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন– যখন ভোর হয় তখন রাতের সব সালাত এবং বিতরের সময় চলে যায়। অতএব তোমরা সকাল হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করে নাও।[২৩]

উপরের হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের পর বিতর সালাত আদায় করা সবচেয়ে উত্তম সময়। তবে 'ইশার পরে বা মধ্য রাতে যে কোনো সময় পড়া সুন্নাহসম্মত। বিতর সালাত শুধু 'ইশার ওয়াক্তে পড়তে হয় এমন ধারনা ভুল।

আল্লাহ আমাদেরকে নবীজি (ﷺ)-এর অসিয়্যাতকৃত উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি 'আমল সারাজীবন আঁকড়ে ধরার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[২১] *বুখারী- হা. ৯৯৯, ১০০০, ১০৯৫; মুসলিম- হা. ৭০০।*

[২২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৪৬৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৮৮; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৪৩১।*

[২৩] *আত্ তিরমিযী- হা. ৪৬৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১২৯০।*

...তিন প্রশ্ন ও ইসলাম গ্রহণ

[২৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

আবূ আইয়্যুব আনসারী বললেন, আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করুন, আপনারা চলুন। তারপর নবী করীম (ﷺ) যখন আবূ আইয়্যুবের ঘরে পৌঁছলেন, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি সত্য দিন নিয়ে এসেছেন। ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভালোভাবেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার ছেলে। আমি তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে। আপনি তাদেরকে ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের খবরটা তারা জানার পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করুন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তাহলে তারা আমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। তখন নবী (ﷺ) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা এসে নবী করীম (ﷺ)-এর খেদমতে হাযির হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং মহান আল্লাহকে ভয় করো। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি আল্লাহর রাসূল এবং হক্ব দিন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। তারা বলল, আমরা এটা জানি না। একথা নবী করীম (ﷺ)-এর কাছে তারা তিনবার বলল। নবী (ﷺ) বললেন, আচ্ছা বলতো, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম তোমাদের মাঝে কেমন লোক? তারা বলল, তিনি তো আমাদের নেতার ছেলে এবং আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ও শ্রেষ্ঠ আলেমের ছেলে। নবী করীম (ﷺ) বললেন, আচ্ছা বলতো যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আবার বললেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আচ্ছা বলতো, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নবী করীম (ﷺ) বললেন, হে ইবনু সালাম! একটু এদের সামনে এসো। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! মহান আল্লাহকে ভয় করো। সেই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, ইনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এবং তিনি সত্য দিন নিয়ে এসেছেন। একথা শুনে তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।[২৪] ☒

---

[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬২১।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৭-০৮ সংখ্যা ❖ ২৪ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ জমাদিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

প্রসঙ্গ : বৈধ উপার্জন

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) একজন যশস্বী আলেম ও ইমাম ছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুয যুহদ'-এ লেখা আছে– 'ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বলে না; বরং যা কিছু মন্দ ও হীন, যা কিছু আত্মার ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর, যা কিছু মহান আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা পরিত্যাগ করতে বলে'। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে–

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।"[১]

এখানে ইসলামের মূল বক্তব্য হলো– মানুষ যেন নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্য সংগ্রহ করে। এটি মানুষের অধিকার। তবে ইসলাম তাকে এ অধিকার দেয়নি যে, সে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করবে। ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভেদরেখা আছে। আর এটি অনুসৃত হলে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তা যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। আরো একটি কারণ ধর্তব্য যে, ঐসলামিক জীবনাচারে ওই সূত্রসমূহ প্রতিপালন প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

হালাল উপার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অবশ্য পালনীয় বিধান। ফরয 'ইবাদত সম্পন্নের পর হালাল উপার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের প্রতি নবী করিম (ﷺ)-এর সতর্কবাণী বিঘোষিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيْ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে।"[২]

সুপ্রিয় পাঠক! আমার ধারণা, বোধ করি আমরা সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক সবারই মাঝে চরম হতাশা ও প্রাপ্তির যোগ যেন পেয়ে বসেছে। চাকরিতে ঘুষ, অফিস ফাঁকি দেয়া নিত্যদিনের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থ ছাড়া তারা কোনো কাজই করেন না। নড়ে না ফাইল। আমাদের দেশের জনৈক রাষ্ট্রপতিও একটি এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পিড মানি দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যা দেশময় ট্রল হয়ে পড়েছিল। যুগিয়েছিল হাসির খোরাক। বাংলাদেশে রূপপুরের বালিশকাণ্ড, ঢাকার ছাগলকাণ্ড কে না জানে? এসবই অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের প্রমাণ।

সম্প্রতি আমাকেও এমনি বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। জমির খাজনা আছে। আছে খারিজ, কিন্তু পর্চাতে নেই। এখন কী করা? পরামর্শ হলো শতক পিছু কিছু টাকা দিয়ে কাজ সেরে নিতে হবে। তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কি বেতন ভাতা পান না?

হ্যাঁ, পান। কিন্তু সীমাহীন চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে চৌকান্না সরকারি কর্মচারীরা। পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে গো-বেচারাদের- যারা হতদরিদ্র, দিনে আনে দিনে খায়। যার ফলে ওই সকল কর্মকর্তার দু'আ কবুল হচ্ছে না। দু'আ সন্দেহাতীতভাবে 'ইবাদত। নু'মান ইবনু বাশীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে বর্ণিত।

★**ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১] *সূরা আল-কাসাস : ৭৭।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৫৯।*

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ)".

নবী (ﷺ) বলেছেন : দু‘আও একটি ‘ইবাদত। তোমাদের রব বলেছেন : “তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো”।[১]

কিন্তু দু‘আ কবুল হচ্ছে না– কারণ, যারা অবৈধ উপার্জন করে, তাদের উপার্জিত খাদ্য ও অর্থ অবৈধ। ফলে, তাদের দ্বারা অর্জিত রক্ত, গোশ্ত সবই হারাম দ্বারা পুষ্ট হয়। এ অবস্থায় এমন দু‘আ কখনো কবুল হবে না। রাসূল (ﷺ)-এর বাণী অনুযায়ী : ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মু’মিনদের সেই আদেশ দিয়েছেন যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূল (ﷺ)-কে।’ কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে, ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদের রুজি হিসেবে দান করেছি।’ প্রসিদ্ধ সাহাবি আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) সূত্রে জানা যায়–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তার প্রেরিত রসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মু’মিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ".

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার করো এবং ভালো কাজ করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।”[২]

তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন,

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ".

“তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোনা, আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিয্ক হিসেবে দিয়েছি তা খাও।”[৩] অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, “হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু‘আ তিনি কী করে কবুল করতে পারেন?”[৪]

মহান আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর চাচা ইবনু ‘আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে– একদিন রাসূল (ﷺ)-এর কাছে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করা হলো– ‘হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো।’ তখন সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! দু‘আ করুন, যেন আমার দু‘আ কবুল হয়। রাসূল (ﷺ) বললেন, হে সা’দ! তোমার পানাহারকে হালাল করো, তবে তোমার দু‘আ কবুল হবে।[৫]

আর একটি কারণে হালাল উপার্জন জরুরি। তা হলো হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়। উপার্জনে বরকত লাভ করতে হলে তা অবশ্যই হালাল উপায়ে হতে হবে। কারণ বরকত দানের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ। আর বরকত হলো কোনো বস্তুর বা কাজে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও বৃদ্ধি, যার মাধ্যমে অল্প জিনিষেও অধিক উপকার, স্থায়িত্ব ও শান্তি লাভ হয়। আরবি ভাষা থেকে উৎসরিত, শব্দটি বারাকাহ ধাতু থেকে নিচয়িত। যার অর্থ- স্থিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কল্যাণ লাভ করা ইত্যাদি। যা মু’মিনদের জীবনে স্ফুরণ যোগায়। যোগায় সাহস ও স্বস্তি। বরকতের প্রসঙ্গে বেশ কিছু বরকতময় আলোচনা মেলে। জানা যায় যে, বরকত হলো বছরের পর বছর কেটে গেলেও ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন না

---

[১] সূরা আল-মু’মিন : ৬০। আবূ দাঊদ- হা. ১৪৭৯, সহীহ।

[২] সূরা আল-মু’মিনূন : ৫১।

[৩] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৭২।

[৪] সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫/১০১৫।

[৫] মু’জামুল আওসাত- ইমাম তাবরানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১০।

সূচীপত্র

পড়া। বরকত হলো আয়ের পরিমাণ কম, তবু পরিবারের সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়া। বরকত হলে ঘরের ছোট-বড় আসবাবপত্র দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা। বরকত হলো ঘরের ছোট-বড় আসবাবপত্র দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা। বরকত হলো পরিচিতি কম, বন্ধু-বান্ধব অল্প, কিন্তু যারা আছে তারা সত্যিকারের সহানুভূতিশীল ও বিশ্বস্ত। বরকত মানে শুধু টাকা-পয়সার প্রাচুর্য নয়; বরকত মানে কম থাকলেও তাতে তৃপ্তি পাওয়া, কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া, আর অল্প জিনিসেই হৃদয়ের অফুরন্ত খুঁজে পাওয়া।

হালাল উপার্জন শুধু বরকতই নয়; জান্নাত লাভের উপায়ও বটে। হালাল উপায় অবলম্বনকারী ব্যক্তি পরকালীন জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ উপায় অবলম্বিত অর্জন পরকালীন জীবনে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি করবে। ইবনু ‘আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন : আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে, তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম। অনুরূপ হাদীসের উদ্ধৃতি মেলে কা’ব ইবনু ‘উজরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র বর্ণনাতে। সেখানে উল্লেখ আছে– যে শরীর হারাম দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না।[1]

যারা আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবন যাপন করবে, তারা পুরস্কৃত হবে। তবে যারা অবৈধ উপায়ে অর্জন করে, তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্য এবং তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত এবং তার পরিণাম হবে জাহান্নাম।

ইতঃপূর্বে আমরা সবিনয়ে উল্লেখ করেছি যে, হালাল উপার্জন দু‘আ কবুলের পূর্বশর্ত। দু‘আও কিন্তু ‘ইবাদত।[2] দু‘আসহ সকল ‘ইবাদত কবুলের শর্ত হলো হালাল উপার্জন। মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু যদি এ উপার্জন অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়, তাহলে তো শরীরের বৈধ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এর ফলে শরীরের রক্ত ও গোশ্তে অবৈধ উপাদান মিশে যায়, যা তার ‘ইবাদতকে অকার্যকর করে তোলে। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। যে কারণেও যাঁর কাছে মানুষ সমর্পিত হবেন, তার তো ‘ইবাদত শর্তহীনভাবে হালাল হতে হবে। হালাল জীবিকার মাধ্যমে গঠিত শরীরের উপস্থাপনা হবে শক্তিশালী। মানুষ যা-ই যাচঞ্ঞা করবে তা-ই বারগাহে মাওলা কবুল হবে।

অন্যের মনে কষ্ট দিয়ে গতানুগতিকতা অবলম্বন করে অর্জিত অর্থ কাজেই আসবে না। জবরদস্তি কিংবা শর্তারোপ করে অর্থ সংগ্রহও হালালের আওতায় পড়ে না। দাঈ’ হিসেবে মহান আল্লাহর দেয়া জান, মাল ও সময় ব্যয় করার মানসিকতা পোষণ তো প্রতিদান পাবার আশা রাখে। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত নবী-রাসূলগণ, সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দিনান্ত দা’ওয়াতের কাজে ব্যয় করেছেন। নিত্যপ্রয়োজনের কোনো চিন্তাই করতেন না। কেননা তারা বিলক্ষণ জানতেন, গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রিয্কের একক মালিক আল্লাহ। সুতরাং তার কাছেই পাবার দৃঢ় আশা নিয়ে তারই কাজ করতেন। এ যামানেতেও আমি বরকতের সীমাহীন অবদান লক্ষ্য করেছি। পঞ্চাশ জনের খানায় অনায়াসে দেড়শ’ জন আহার করেছে।

তাবুকের যুদ্ধেও আমরা অনুরূপ বরকতময় ঘটনা সম্পর্কে জানতে পাই। ইসলামী জিন্দেগীর পরতে পরতে বরকতের সীমাহীন উপাদান লক্ষ্য করা যায়। তবে শর্ত হলো উপার্জন হালাল হতে হবে। পরিবার-সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নয়নের বরকতময় আবহ তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ তার কাজে-কর্মে ঐশী ভাবনাকে পুঁজি করে সব কিছু সম্পাদন করবে।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আমাদের ইহকালীন জীবনের পরীক্ষা হলো আমরা বরকত অর্জন করতে পারছি কি না। একদা একজন আল্লাহর বান্দা বলছিলেন আমার ‘ইবাদত দ্বারা দুনিয়াতেই একটু করো শুকনো রুটির বন্দোবস্ত করতে পারছি কি? যদি না পারি তবে কিংবা অর্জনের বিশ্বাস যদি না থাকে তবে কীভাবে আমরা অনন্তকালের নিবাস জান্নাতে যেতে পারি। সুতরাং আসুন! আমরা বৈধ উপার্জনে অভ্যস্ত হই। গড়ে তুলি মহান আল্লাহর নৈকট্য। কারণ, এটিই হবে মানব জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। ☒

---

[1] *মুসনাদ আবী ইয়া’লা- আবূ ইয়া’লা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।*

[2] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৭৯, সহীহ।*

দু‘আ কবুলের সুন্নাহনির্ভর পদ্ধতি

–আবু ফাইয়ায

মুনাজাত, দু‘আ ও যিকির অনেকটা একার্থবোধক শব্দ এবং একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক ওতপ্রোত। মুনাজাতের আভিধানিক অর্থ অন্তরের কথা চুপিসারে বলা বা কানে কানে কথা বলা এবং এই কানে কানে কথা বলাটা দু’জনের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ- বান্দা স্বীয় রবের সাথে চুপিচুপি কথা বলবে, যেখানে তৃতীয় কারো উপস্থিতি বা মাধ্যম থাকবে না। দু‘আ’র আভিধানিক অর্থ নিজের প্রত্যাশিত বস্তু লাভের আশায় মহামহিম আল্লাহর কাছে যাচঞা করা। আর ‘যিকির’ শব্দের আভিধানিক অর্থ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। অর্থাৎ- মুনাজাত কিংবা দু‘আ সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾

“কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমিও তোমাদের স্মরণ করবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না”।[1] আরো ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো”।[2]

ফাযায়েলে দু‘আ

দু‘আ-জিকির এবং মুনাজাতের বহুবিধ এবং সর্বব্যাপী উপকারিতা ও কল্যাণ এবং দু‘আ-জিকির না করার সমূহ অকল্যাণ রয়েছে।

প্রথমত: বান্দা যখন স্বীয় রবের কাছে প্রার্থিত বস্তু যাচঞা করে, তখন আল্লাহ তা প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন :

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

“আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো”।[3] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ﴾

“আর আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তো সন্নিকটেই আছি। আমি সাড়া দেই প্রার্থনাকারীর ডাকে যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে”।[4] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟

প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বরকতময় মর্যাদাবান রব দুনিয়ার প্রথম আসমানে অবতরণ করে (স্বীয় বান্দাকে) আহ্বান করে বলেন, যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করব। আর যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[5]

দ্বিতীয়তঃ দু‘আর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, রোগ-বালাই ইত্যাদি দূর করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِيْ الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

“হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় ও মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও রহমত”।[6]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ».

“দু‘আ আগত ও অনাগত বালা-মুসিবাত প্রতিরোধে উপকারী। অতএব তোমরা বেশি করে দু‘আ করো”।[7]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

«لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِيْ الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ».

“দু‘আ ব্যতীত অন্যকিছু ফায়সালাকে (ভাগ্য) পরিবর্তন করতে পারে না এবং কল্যাণকর কাজই আয়ু বৃদ্ধির সহায়ক”।[8]

---

[1] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫২।*

[2] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৪১- ৪২।*

[3] *সূরা গাফির : ৬০।*

[4] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৬।*

[5] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০৭৭।*

[6] *সূরা ইউনুস : ৫৭।*

[7] *জামি‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৮; হাকিম, মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২০৪৪; সহীহ আল জামি‘ আস্ সাগীর- হা. ৩৪০৯, হাসান।*

[8] *হাকিম- হা. ১৮৬৫, জামি‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩৯, হাসান; সিলসিলাতুল আহাদীসূল সহীহাহ্- হা. ১৫৪।*

তৃতীয়তঃ দু‘আর মাধ্যমে যাচঞা পূরণ ও বিপদ-মুসিবত দূর হওয়ার পাশাপাশি এই দু‘আকে উত্তম বলে ‘ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ”।[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

দু‘আই হলো ‘ইবাদত।[২]

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

দু‘আ হলো ‘ইবাদতের মগজ।[৩]

চতুর্থতঃ দু‘আর মধ্যে সফলতা নিহিত আছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

“তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও”।[৪]

পঞ্চমতঃ দু‘আ না করলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ﴾

“যে আল্লাহর যিকির করে না, তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়”।[৫]

উপর্যুক্ত ফাযায়েল ছাড়াও দু‘আ-যিকির মুনাজাতের দ্বারা প্রভূত দুনিয়াবি কল্যাণ লাভ করা যায়। আর পরকালীন প্রাপ্তি! যা আমাদের ধারণা ও কল্পনার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

উল্লেখ্য যে, আমরা কখনো কখনো ধৈর্যহারা হয়ে অভিযোগ করি, এতো দু‘আ করলাম, কিন্তু কবুল হওয়ার কোনো আলামতই পেলাম না। মূলতঃ আল্লাহর কোনো বান্দা যখন দু‘আ কবুল হওয়ার শর্তসমূহ যেমন- ইখলাস অবলম্বন, হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন ইত্যাদি পূরণ করে সুমহান রব-এর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন তিনি তার দু‘আ-প্রার্থনা, কবুল করেন। তবে কখনো আমরা তা হাতেনাতে পেয়ে যায়, কখনো উপলব্ধি করি, আবার কখনো আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে পারে না। অর্থাৎ- মৌলিকভাবে তিনটি উপায়ে দু‘আ কবুল হয়ে থাকে। যথা :

০১. আমরা যা চাই, আল্লাহ তা‘আলা তা-ই আমাদেরকে প্রদান করেন, কখনো স্বল্পসময়ে আবার কখনো বিলম্বে।

০২. আমরা যা চাই, আল্লাহ তা‘আলা সরিসরি প্রার্থিত বস্তু আমাদেরকে প্রদান করেন না, তবে এর বিনিময়ে তিনি সমপরিমাণ কিংবা বড়ো কোনো বিপদ-মুসিবত দূর করার মাধ্যমে যাচঞাকারীর প্রার্থনা কবুল করেন। কিন্তু আমরা এটা সবসময় উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারি না এবং

০৩. আমারা যা চাই, তা সরাসরি আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে প্রদান করেন না, আবার কোনো বিপদ-মুসিবতও দূর করেন না, তবে এই প্রার্থনার বিনিময়ে তিনি হয়তো পরজীবনে এমন পুরস্কার দান করবেন, যা আমাদের কল্পনাশক্তি ও উপলব্ধিবোধ সবকিছুর বাইরে। এটি মূলতঃ অগ্রসর মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহর পরীক্ষা।

এখন প্রশ্ন হলো– বান্দা তার প্রতিপালক সুমহান রবের কাছে কীভাবে চাইবে? এর জবাব হলো– বান্দা কাঙ্খিত বস্তু সরাসরি তার প্রভুর কাছে চাইতে পারে। তবে বৈধ এমন কিছু ওসিলা রয়েছে, যা যাচঞাকারীর প্রার্থনাকে শক্তিশালী করে। নিম্নে এরূপ বৈধ ওসিলা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো–

০১. ইস্‌মি আযম-এর ওসিলায় দু‘আ করা

‘ইস্‌মি আযম’ অর্থ আল্লাহ তা‘আলার সুমহান নাম। নিম্নবর্ণিত দু‘আটিতে তাঁর সুমহান নামসমূহ উচ্চারিত হয়েছে। এ দু‘আ পাঠ করে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার কাছে কিছু চাইলে, তিনি অবশ্যই প্রার্থনাকারীকে তা প্রদান করবেন।[৬] **দু‘আ–**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আংতাল্লাহ্, লা-ইলা-হা ইল্লা- আংতাল্ আহাদুস্ সমাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্। **অর্থ :** হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আবেদন করছি। কেননা তুমিই সুমহান আল্লাহ! আর তুমি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তুমি একক সত্তা,

---

[১] *সূরা আল ‘আনকাবূত : ৪৫।*

[২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১২৬৪; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৯৫।*

[৩] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩২৯৩, গারীব।*

[৪] *সূরা আল জুমু‘আহ্ : ১০।*

[৫] *সূরা আয্ যুমার : ২২।*

[৬] *মিশকাত- হা. ২২৮৯; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৮৫৭, সহীহ।*

স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তার সমকক্ষ কেউই নেই।[১]

০২. আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের ওসিলায় দু'আ করা

আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয় একক সত্তা। তিনি অনাদি-অনন্ত, চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকল সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। দুনিয়ার সকল কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর সৃষ্টির বিশালতা মনুষ্যজ্ঞানের সীমানা অতিক্রম করেছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সৃষ্টির জন্য তার স্রষ্টার পরিচয় জানা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্য থেকে ৯৯টি সিফাতী নামের মাধ্যমে আমরা তাঁর পরিচয় সম্পর্কিত সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। যেমন-

اَلرَّحْمٰنُ আর্ রহমান নামের মাধ্যমে তাঁর সীমাহীন দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

اَلْمَلِكُ আল মালিক নামের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি জানা-অজানা সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি।

اَلرَّزَّاقُ আর্ রায্যাক নামটি এ পরিচয় বহন করে যে, জিন্-ইনসান, গহীন অরণ্যের জীব-জন্তু, সুবিশাল সমুদ্রের মৎস্যকুল, সুবিস্তীর্ণ আকাশে ভাসমান পক্ষীকুল সকল মাখলুকাতের খাদ্যের জোগানদাতা আল্লাহ তা'আলা।

এরকম ৯৯টি সিফাতী বা গুণবাচক নামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে এই ৯৯টি নামের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার গুণ সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অসীম ও অগণনীয়।

ফযীলত : নিম্নের বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর গুণবাচক নামসমূহ অফুরন্ত ফযীলত ও নিয়ামতে পরিপূর্ণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ:) : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ([illegible]) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার এমন নিরানব্বইটি– এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

জ্ঞাতব্য : আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ সংরক্ষণ করার অর্থ হলো তাঁর গুণবাচক নামসমূহ উপলব্ধি করা এবং প্রতিটি নামে যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এসেছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসসহ সেই নামের ওসিলায় দু'আ-মুনাজাত করা। যেমন-

اَلرَّحْمٰنُ আর্ রহমা-ন ও **اَلرَّحِيْمُ আর্ রাহীম** নামের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা প্রার্থনা করা।

اَلرَّزَّاقُ আর্ রায্যাক ও **اَلْمُغْنِيُ আল মুগনীয়্যু** নামের ওসিলায় আল্লাহর কাছে রিযিক ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রার্থনা করা।

اَلْغَفَّارُ আল গফ্ফার ও **اَلْغَفُوْرُ আল গফূর** নামের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

এভাবে প্রতিটি গুণবাচক নামের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করে সেই নামের ওসিলায় মহান আল্লাহর কাছে অশ্রুসজল নয়নে দু'আ করলে তিনি তাঁর বান্দার দু'আ কবূল করবেন ইন্শা-আল্লাহ।

০৩. 'আমলে সালেহ্ বা নেক কাজের ওসিলায় দু'আ করা

বান্দা যখন স্বীয় 'আমলে সালেহ্ বা নেক কাজের ওসিলা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে, তখন তিনি তার নেক কাজের বিনিময়ে তার যাচঞা পূরণ করেন। এ সম্পর্কিত একটি বহুল প্রচারিত সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই এ বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়। সহীহুল বুখারী'র হাদীসে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'একদা তিন ব্যক্তি পথ অতিক্রম করছিল। পথিমধ্যে বৃষ্টি নামল। তখন তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো। ইত্যবসরে পাহাড়ের গা থেকে একটি পাথরখণ্ড খসে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, আপন আপন নেক 'আমলের প্রতি লক্ষ্য করো যা তোমরা মহান আল্লাহর দরবারে সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছ এবং সেই নেক 'আমলের ওসিলায় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকো; আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা পাথরটি তোমাদের থেকে সরিয়ে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। আমার একজন স্ত্রী ও ছোটো ছোটো সন্তানাদি ছিল। আমি তাদের জীবিকার জন্য চারণভূমিতে মেষ বকরী চরাতাম। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে আমি সেগুলোর দুধ দোহন করতাম এবং আমি আমার পুত্র-কন্যাদের আগে আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন একটা গাছ আমাকে দূরে নিয়ে গেল

---

[১] *মিশকাত- হা. ২২৮৯; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৮৫৭, সহীহ।*

[২] *বুখারী- মা. শা., ২৭৩৬, ৭৩৮২ ও মুসলিম- মা. শা., ৬/২৬৭৭।*

(অর্থাৎ- চরণভূমি দূরে ছিল)। এতে আমার ঘরে ফিরতে রাত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে (পিতা-মাতাকে) ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। এরপর আমি পূর্বের মতই দুধ দোহন করলাম। আমি দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করা অপছন্দ মনে করলাম এবং তাদের আগে আমার সন্তানদের দুধ পান করানোও অপছন্দ মনে করলাম। তখন আমার সন্তানরা ক্ষুৎপিপাসায় আমার দুই পায়ের কাছে কাতরাচ্ছিল। তাদের ও আমার এই অবস্থা চলল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। যদি আপনি মনে করেন যে, আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি, তাহলে আমাদের জন্য একটি সুড়ঙ্গ করে দেন, যাতে করে আমরা আসমান দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাতে একটি সুড়ঙ্গ করে দিলেন। তা দিয়ে তারা আসমান দেখতে পেল।

আর একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ঘটনা এই যে, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ যেভাবে নারীকে ভালোবাসে আমিও তাকে তেমন ভালোবাসতাম। আমি তাকে একান্ত কাছে পেতে চাইলাম। সে তাতে অস্বীকৃতি জানালো এবং একশত দীনার বায়না ধরলো। আমি চেষ্টা করে একশত দীনার সঞ্চয় করলাম। এরপর সেগুলো নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! মহান আল্লাহকে ভয় করো। অন্যায়ভাবে ছিপি খুলো না (কুমারিত্ব নষ্ট করো না)। এ কথা শুনে আমি তার উপর থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আপনি যদি মনে করেন যে, একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি এ কাজ করেছি তাহলে আমাদের জন্য সুড়ঙ্গের পথ উন্মুক্ত করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য (পাথরটি সরিয়ে) আরো একটু ফাকা করে দিলেন।

অপর (তৃতীয়) ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক শস্যের বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করে তার প্রাপ্য মজুরী দাবি করল। আমি এক ফারাক তার সামনে পেশ করলাম। কিন্তু সে তা নিল না। আমি সে শস্য জমিনে চাষ করতে থাকলাম। পরিশেষে তা দিয়ে গরু, বকরী ও রাখাল সংগ্রহ করলাম। পরে সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় করো। আর আমার প্রাপ্য পরিশোধের ব্যাপারে আমার উপর জুলুম করো না। আমি বললাম, তুমি এই গরু ও রাখাল নিয়ে যাও। তখন সে তা নিয়ে চলে গেল। যদি আপনি মনে করেন যে, আমি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি, তাহলে (সুড়ঙ্গ পথের) অবশিষ্ট অংশ খুলে দিন। তখন আল্লাহ গুহা মুখের অবশিষ্ট অংশ খুলে দিলেন।'[১]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, অধিক নেক 'আমল করে সেই 'আমলকে ওসিলা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে যাচঞা করলে তিনি অবশ্যই বান্দার চাওয়া পূরণ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপর্যুক্ত বৈধ ওসিলা গ্রহণ এবং যাবতীয় অবৈধ ও শির্কী ওসিলা পরিত্যাগ ও বর্জন করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

যে দু'আ করতে নেই

এমন কিছু কথা আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে, উত্তেজিত কিংবা রাগান্বিত অবস্থায় বলে ফেলি; যা বদ্-দু'আয় রূপান্তরিত। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের দু'আ বা বদ্-দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-

- জাবির (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা কখনো নিজের উপর, সন্তান ও সম্পদের উপর বদ্দু'আ করো না। হয়ত ঐ সময়টি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ কবূল হওয়ার সময় হতে পারে। আর যদি ঐ দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবূল করে নেন, তাহলে তোমাদেরই ক্ষতি"।[২]
- সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। "মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা কেউ মৃত্যু কামনা করো না এবং মৃত্যু আসার আগেই তার জন্য দু'আ করো না। কেননা যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন 'আমলের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। সাওয়াবের মধ্যেই মুমিন বান্দার আয়ু নিহিত রয়েছে"।[৩]
- আনাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে অপর এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : কোনো কষ্ট-মুসীবতের জন্য তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। যদি কাউকে এ ধরনের দু'আ করতে হয় তাহলে সে যেন বলে– হে আল্লাহ! আমার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা উত্তম ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখ। আর যখন আমার জন্য মৃত্যু উত্তম হবে তখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিও"।[৪]

অতএব দু'আ করার সময় যাবতীয় নেতিবাচক বাক্য থেকে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক মা-বাবা প্রায়শ সন্তানদেরকে ভর্ৎসনা বা অভিশাপ দিয়ে থাকেন; তা আদৌ কাম্য নয়। কেননা সেই অভিশাপ আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহীত হয়ে গেলে সর্বনাশ অনিবার্য। অতএব সাবধান! ❑

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৯৮।*

[২] *সহীহ মুসলিম- বাং ই. ফা., হা. ৬৫৭৫।*

[৩] *সহীহ মুসলিম।*

[৪] *সহীহ মুসলিম- বাং ই. ফা., হা. ৬৫৭০।*

নববী দু‘আ : এক অনন্য সৌভাগ্যের পরশ

–মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী[★]

[দ্বিতীয় (শেষ) পর্ব]

৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন আবূ হুরাইরাহ্। তিনি প্রায় ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোনো হাদীস তিনি ভুলে যেতেন না। যদিও ভুলে যাওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাঁর এই অসাধারণ স্মরণশক্তির পিছনে আছে রাসূল (ﷺ)-এর দু‘আর বারাকাহ। একদা তিনি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে বিনীত স্বরে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি আপনার থেকে অনেক হাদীস শুনি, কিন্তু পরক্ষণেই তা ভুলে যাই’।

রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘তোমার চাদরটা বিছিয়ে দাও’।

আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম। রাসূল (ﷺ) দু’হাত ভরে তা চাদরের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললেন, ‘জড়িয়ে নাও’।

আমি চাদরটি বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি আর কখনো কোনো হাদীস ভুলিনি।[১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর মা মুশরিক থেকে যান। এমনকি তিনি রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে অশালীন বাজে মন্তব্য করতেন। আবূ হুরাইরাহ্ তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা ইসলামের দা’ওয়াত দিতে থাকেন কিন্তু তিনি কোনোমতেই ইসলামে রাজি হচ্ছিলেন না। একদিন আবূ হুরাইরাহ্ ভাঙা মনে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বিনয়ের সাথে বললেন,

হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার মা কিছুতে ইসলাম মেনে নিচ্ছেন না! আপনি একটু আমার মায়ের জন্য দু‘আ করুন। রাসূল (ﷺ) আল্লাহকে ডেকে বললেন,

হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরাইরাহ্’র মাকে হেদায়াত দাও।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ﷺ)-এর কাছ থেকে দু‘আ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। দরজার কাছাকাছি আসলে তাঁর মা তাঁকে সেখানেই থেমে যেতে বলেন। গোসল করলেন, জামা পরলেন এবং তাড়াহুড়োতে খিমার না পরেই দরজা খুলে দিয়ে কালেমা শাহাদাহ পাঠ করে মুসলিম হয়ে গেলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) খুশিতে আত্মহারা হয়ে আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে নয়ন ভরা অশ্রু ছাড়তে ছাড়তে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। মায়ের ইসলাম কবুল করার সুসংবাদ দিয়ে আবেদন করলেন,

হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহকে একটু বলুন না, তিনি যেন আমাকে ও মাকে সকল মু’মিনদের কাছে প্রিয় করে দেন। আর তাঁদেরকেও আমাদের প্রিয়ভাজন করে দেন।

রাসূল (ﷺ) তাঁর এই আবেদন রাখলেন এবং দু‘আ করলেন। যে দু‘আর ফলে এমন কোনো মু’মিন নেই, যিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দেখেছেন কিংবা তাঁর কথা শুনেছেন কিন্তু তাঁকে ভালোবাসেননি।[২]

৯. আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) : আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। যেখানে অন্য আবাদী জমিতে বছরে একবার ফসল হতো, সেখানে তাঁর বাগানে বছরে দু’বার ফল ধরত।[৩]

শুধু তাই নয়, তাঁর ছিল ১০০টিরও বেশি সন্তানাদি। সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি জীবনধারণের সময় পেয়েছিলেন, তিনি হলেন আনাস। ১০৩ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। তাঁর এমন দীর্ঘ হায়াত, শতাধিক সন্তান ও অঢেল ধনদৌলতের পিছনে ছিল রাসূল (ﷺ)-এর দু‘আ।

ছোটবেলায় তাঁর মা উম্মু সুলাইম তাঁকে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এনে বলেন,

হে আল্লাহর রাসূল! এই হলো আনাস, আমার ছেলে, সে আজ থেকে আপনার খাদেম। তাঁর জন্য একটু দু‘আ করুন। রাসূল (ﷺ) দু‘আ করে দিলেন,

«اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ».

হে আল্লাহ! তাঁকে (আনাসকে) অঢেল সম্পদ দাও ও সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। তুমি তাঁকে যা দিয়েছ, তাতে বারাকাহ দাও।[৪]

১০ ও ১১. হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) : রাসূল (ﷺ)-এর আদরের দু’নাতি ছিলেন হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল তাঁদের এত বেশি ভালোবাসতেন যে, কোলে তুলে আদুরে চুমু এঁটে দিতেন তাঁদের গালে। কখনো বা সালাতে

[★] প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাদ্‌রাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

[১] সহীহুল বুখারী- হা. ১১৯।

[২] সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৯১।

[৩] আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিছ সাহাবা- ১/২৭৭।

[৪] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৪, ৬৩৭৮, মা. শা., হা. ৬৩৩৪।

সূচীপত্র

তাঁদেরকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁদেরকে এত মমতা করতেন যে, তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا».

হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। তুমিও তাঁদেরকে ভালোবাসো।[১]

সুবহানাল্লাহ! জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি যাদের বলেন, 'ভালোবাসি'।

তাহলে তাঁদের আর কীসের অভাব! ভালোবাসার নয়নমনী মুহাম্মাদ (ﷺ) রবকে ডেকে বলছেন,

হে আল্লাহ! তুমি তাঁদেরকে ভালোবাসো।

এর চেয়ে বড় পাওয়া আর এই জীবনে কী হতে পারে!

শুধু কী তাই! ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) যে বাক্য দিয়ে তাঁর দু'সন্তান ইসমা'ঈল ও ইসহাক (আলায়হিস সালাম)-এর জন্য দু'আ করতেন, ঠিক একই বাক্য ব্যবহার করতেন রাসূল (ﷺ) তাঁর প্রিয় দুই স্নেহের দুলালের জন্য। তিনি তাঁদের মাথায় হাত রেখে বলতেন,

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ".

আমি মহান আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণীর মাধ্যমে শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২]

সুবহানাল্লাহ! নবীকুলের শিরোমণির এমন দু'আর পরও কোন অশুভ দৃষ্টি আছে, তাঁদের দিকে তাকাতে পারে?

কোন শয়তান আছে, তাঁদের ক্ষতি করতে পারে? কোন বিষদাঁত আছে, তাঁদেরকে ছুঁতে পারে?

এমনকি কলিজার নাতিদের ভালোবাসাকে তিনি নিজের ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন, 'যারা তাঁদেরকে ভালোবাসল, তারা আমাকে ভালোবাসল। আর যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করল, তারা আমাকে ঘৃণা করল'।[৩]

১২. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) : বদরের তুমুল যুদ্ধে যখন আকাশ-বাতাস থমকে স্তব্ধ, যখন সাহাবীদের একমাত্র শক্তি ঈমান আর একমাত্র সম্বল মহান আল্লাহর সাহায্য, ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে এক বীর মুজাহিদ সাহাবী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস তির ছুঁড়ছিলেন শত্রুবাহিনীর উপর। তূণীর থেকে তির বের করে ধনুকের সুতাই লাগাতে লাগাতে তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! কাঁপিয়ে দাও শত্রুর পা, ভয় ঢুকিয়ে দাও তাদের অন্তরে, ধ্বংস করো তাদের সব পরিকল্পনা'। তাঁর এই দু'আ শুনে পাশ থেকে রাসূল (ﷺ) বারবার বলছিলেন, 'আল্লাহ! তুমি সা'দের দু'আ কবুল করো'। সেইদিন থেকেই শুরু হলো সা'দ-এর দু'আ কবুলের যাত্রা। তিনি যে দু'আই করতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কবুল করে নিতেন। তিনি এই মহান তাওফীক্ব পেয়েছিলেন রাসূল (ﷺ)-এর দু'আর বরকতে। রাসূল (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন,

«اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ».

হে আল্লাহ! সা'দের দু'আগুলো তুমি কবুল করে নিয়ো।[৪]

১৩. 'উরওয়াহ্ ইবনু আবিল জা'দ আল-বারেক্বী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) : রাসূল (ﷺ) তাঁকে একটি ছাগল কেনার জন্য এক দীনার দেন। তিনি সেই দীনার দিয়ে দু'টি ছাগল কিনেন। দু'টির মধ্যে একটিকে আবার এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করেন। এরপর সেই দীনার ও আগে কেনা ছাগলটি নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হন। রাসূল (ﷺ) তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেন।

عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، قَالَ : «أَعْطَاهُ النَّبِيُّ (ﷺ) دِيْنَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ كَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ»،

'উরওয়াহ্ বারেক্বী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) একটি বকরী ক্রয়ের জন্য তাকে একটি দিনার দিলেন। তিনি ঐ দীনার দিয়ে দু'টি বকরী কিনলেন। অতঃপর এক দীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী (ﷺ)-এর খিদমতে একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হবার জন্য দু'আ করে দিলেন। অতঃপর তার অবস্থা এমন হলো যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি কিনতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।[৫]

---

[১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭৮২, সহীহ।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৭১।*

[৩] *ফাতহুল বারী- ইবনু রজব, ১/৬৫।*

[৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭৫১।*

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬৪২।*

১৪. উক্কাশাহ ইবনু মিহসান (রযিয়াল্লা-হু আনহু) : একদিন সাহাবীদের মাঝে বসে রাসূল (ﷺ) বললেন, আমার কাছে সব উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। তাদের মাঝে বড় একটি দল আমার উম্মত। আর আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

এই বলে রাসূল (ﷺ) মজলিস থেকে উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বলাবলি শুরু করলেন, কারা হবে এই সৌভাগ্যবান ৭০ হাজার মানুষ? রাসূল (ﷺ) বের হয়ে এসে তাঁদের এমন উদ্বিগ্নতা দেখে বললেন,

«هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ، وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلَا يَكْتَوُوْنَ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ»....

তাঁরা হলো– যারা কখনো রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) করবে না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে। মসলিজের মধ্য থেকে ‘উক্কাশাহ্ ইবনু মিহসান দাঁড়িয়ে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তাদের মধ্যে কি আমি আছি? আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের মধ্যে একজন। তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে কি আমিও আছি? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘উক্কাশাহ্ এ সুযোগ তোমার আগেই নিয়ে নিয়েছে।[২]

১৫. জারির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ আল বাজালী : তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি আমাকে যুলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশ‘আম গোত্রের একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কা‘বা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ’ অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু‘আ করলেন,

«اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»....

হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন। অতঃপর জারীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এ খবর দেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু)’র দূত বলতে লাগল, কসম সে আল্লাহ তা‘আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যুলখালাসার মন্দিরটি যে পাঁচড়া যুক্ত উটের মতো। জারীর (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু‘আ করেন।[৩]

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! একবার কল্পনা করুন তো, যার জবান থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি শব্দ ছিল ওয়াহীর ছায়ায় ঢাকা, সেই নবীকুলের শিরোমণি, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি আপনার নাম ধরে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দু‘আ করেন! কত বড় সৌভাগ্য হবে তা!

সাহাবীগণ সেই সৌভাগ্যের আস্বাদ পেয়েছিলেন। তাঁরা নববী দু‘আর বরকতে দুনিয়ায়ও ছিলেন উজ্জ্বল, আর আখিরাতেও তাঁদের মর্যাদা অনন্য। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) যখন বললেন, “আল্লাহ! ওকে তুমি ভালোবাসো” তখন বুঝে নিন, এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কিছু হতে পারে না। তাঁদের জীবন হয়ে উঠেছিল ঝলমলে নক্ষত্র, ঈমান ও আনুগত্যের উজ্জ্বল প্রদীপ।

আজ আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কি তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করছি? আমরা কি নববী সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে চলছি? আমরা কি চাই না, আখিরাতের ময়দানে যখন সবাই ডাক পাবে, তখন আমাদের নামও যেন উচ্চারিত হয়। এরা সে সব মানুষ, যারা নববী ভালোবাসা ও দু‘আ পাওয়ার যোগ্য ছিল।

আসুন, আজ থেকেই প্রতিজ্ঞা করি, আমরা জীবনকে সাহাবাদের মতো করে সাজাবো। রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবো, হৃদয়কে তাঁদের মতো নির্মল করবো। আর বুকের গভীরে লালন করবো সে অমূল্য আকাঙ্ক্ষা হয়তো আমরাও নববী ভালোবাসার ছায়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো, ইন্‌শা-আল্লাহ।

اللّٰهُمَّ ارزقنا حب نبيك (ﷺ)، وارزقنا شفاعته، وارزقنا أن نحشر في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

---

[১] সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬৪২।

[২] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭০৫।

[৩] সহীহুর বুখারী- হা. ৩০২০, ৩০৩৬।

ইসলামী সাহিত্যতত্ত্বে শিশুসাহিত্য

মূল : ড. ইবরাহিম নুওয়াইরি*

ভাষান্তর : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**

মূল বিষয়ে আলোচনার শুরুতে আরবী ও ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। কারণ সংস্কৃতি, পাঠাভ্যাস, চিন্তাদর্শন ও সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বিপুল পাঠকসমাজের একটি অংশ এ ধারার সাহিত্যের পরিভাষা ও তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাদের মন স্বভাবতই চলে যায় আরবী সাহিত্যের সুপরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ইতিহাসগ্রন্থগুলোর দিকে। যেমন- ড. শাওকি দাইফ (মৃত্যু : ২০০৫ খ্রি.) ও ড. উমর ফররুখ (মৃত্যু : ১৯৮৭ খ্রি.)-এর গ্রন্থসমূহ। উভয়েরই রয়েছে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে রচিত সর্বাধিক খ্যাতনামা, সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী বিশ্বকোষধর্মী রচনাবলী। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে, এ দুই পণ্ডিতের সংকলন হান্না ফাখুরী (মৃত্যু : ২০১১ খ্রি.) ও আহমদ হাসান আয-যায়্যাত (মৃত্যু : ১৯৬৮ খ্রি.)-এর রচনাবলীর তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ, অধিক গভীর; এমনকি জার্মান প্রাচ্যবিদ কার্ল ব্রুকেলমান (মৃত্যু : ১৯৫৬ খ্রি.)-এর লেখনিকেও তা অতিক্রম করে যায়।

তবে এটি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কেননা এখানে যেসব রচনাবলীর নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলো মূলত বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্রে গবেষক, শিক্ষার্থী, জ্ঞানপিপাসু ও সাহিত্যানুরাগীদের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃত। প্রকৃতপক্ষে যারা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসকে নানা যুগ ও পর্বে বিভাজিত করে লিখেছেন, তাদের সংখ্যা এত ব্যাপক যে কোনো গবেষকের পক্ষেই তাদের সবার নাম জানা বা তাদের সকল রচনায় পূর্ণ প্রবেশাধিকার লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত সাহিত্যিক মুস্তাফা সাদিক আর রাফিয়ী (মৃ. ১৯৩৭), ড. তাহা হুসাইন (মৃ. ১৯৭৩), আহমদ আমীন (মৃ. ১৯৫৪), আনোয়ার আল-জুন্দী (মৃ. ২০০২) এবং ফরাসি প্রাচ্যবিদ রেজিস ব্লাশের (মৃ. ১৯৭৩) প্রমুখের রচনাবলী।

ইসলামী সাহিত্যের দু'টি ধারা বা শ্রেণি রয়েছে। যথা- প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য এবং সমকালীন ইসলামী সাহিত্য। আরবীভাষী পণ্ডিতদের ব্যঞ্জনাপূর্ণ অভিব্যক্তি অনুসারে প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য– 'আকাশচুম্বী অগ্নিশিখার মতোই সুপরিচিত'। কারণ এটি ইসলামী দা'ওয়াতের আদিপর্বে জন্ম নিয়েছিল এবং ইসলামের মূলনীতি ও নববার্তার পক্ষে বিজয়ের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরবের প্রথম প্রভাতে মুসলমানদের সংগ্রামে মুশরিকদের মোকাবিলা করেছিল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সমর্থন জানিয়েছিল। সর্বোপরি সত্য, একত্ববাদের বিশ্বাস ও ইসলামের মহৎ মূল্যবোধ প্রচারে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল। এ ধারার উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন সাহাবী কবিগণ– 'আলী ইবনু আবী তালিব, হাসসান ইবনু সাবিত, 'আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, কা'ব ইবনু যুহায়র এবং কা'ব ইবনু মালিক প্রমুখ।

অন্যদিকে সমকালীন ইসলামী সাহিত্যকে এমন ধারার সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়, যা মহাবিশ্ব, জীবন ও মানবসত্তা সম্পর্কে ইসলামের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রায়ন করে। অন্তত এটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে না। অথবা এটি এমন সাহিত্য– যা মানুষকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করে, জড়তা ও বিভ্রান্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে, জীবনের বাস্তবচিত্র– সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা সমভাবে চিত্রিত করে এবং যা হৃদয়ে দৃঢ় সংকল্প সঞ্চার করে, মস্তিষ্ককে সুস্থ জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করে, আর মানুষকে পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সত্য, কল্যাণ, ন্যায়, সুবিচার ও সৌন্দর্যের পক্ষে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানায়।

সমকালীন ইসলামী সাহিত্য সেই একই ভূমিতে দাঁড়ায়, যেখানে প্রথম যুগের ইসলামী সাহিত্য বা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রারম্ভিক সাহিত্য দাঁড়িয়ে ছিল– অর্থাৎ- ইসলামী 'আক্বিদাহ্‌কে সমর্থন ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিল। তবে নিঃসন্দেহে আজকের ইসলামী সাহিত্য প্রাচীন ইসলামী সাহিত্যের ধাপ টপকে বহু দূর অতিক্রম করেছে। ফলে আজ ইসলামী সাহিত্যের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক কাঠামো– নিজস্ব ভিত্তি, উপাদান, উদ্দেশ্য

**অধ্যাপক, আল জেরিয়ার শহীদ শেখ তিবেসী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের। সাহিত্যসমালোচক ও শিক্ষাবিদ।*

***** *অনুবাদক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক। কাতার প্রবাসী।*

ও রূপায়নপদ্ধতি এবং এটি আরবী ও ইসলামী বিশ্বের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরবী সাহিত্য বিভাগে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ধারার অংশ হিসেবে পাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া সমকালীন ইসলামী সাহিত্য মুসলিম জাতির নানা ভাষায় রচিত হচ্ছে। তাই আজ প্রকৃত অর্থে এটি বিশ্বসাহিত্যের পর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য ছিল আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধ। উপরন্তু তা ছিল সে সময়ের নবজাত, চ্যালেঞ্জবহুল ও অবরুদ্ধ ইসলামী দা'ওয়াতের আশা-নিরাশা ও সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামী সাহিত্যতত্ত্বে শিশুসাহিত্য

ইসলামী সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সর্বগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াসে শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। এসব প্রচেষ্টার সমন্বিত সিদ্ধান্ত হলো– ইসলামী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী শিশুসাহিত্য বলতে সেসব সাহিত্যকে বোঝানো হয়, যা ইসলাম ও তার মূলনীতি, 'আক্বিদাহ্-বিশ্বাস থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে এরই ভিত্তিতে শিশুর মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, আচরণিক ও শারীরিক সত্তা গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শিশুর জ্ঞানবোধকে বিকশিত করে এবং ইসলামী শিক্ষাবিধির আলোকে তার স্বাভাবিক প্রতিভা ও নানামুখী সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে।[১]

ড. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহসিন শিশুসাহিত্যের পরিভাষাকে আরো বিস্তৃত পরিসরে ও গভীর অর্থবহ করে তুলে ধরেন। তিনি এ ধারার সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত শিল্পরূপ, নান্দনিক বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যবিধার প্রসঙ্গও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ছোটদের উদ্দেশ্যে রচিত যে কোনো সুন্দর ও সৃজনশীল প্রকাশরূপ– যা শিশুর মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে, তাই শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। এতে গদ্য, পদ্য, বর্ণনামূলক ও গীতিধর্মী রূপ, নাট্যরূপসহ সব ধরনের প্রকাশভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত। এ ধারার সাহিত্য শিশুদের মানসিক পরিপক্বতার স্তর অনুযায়ী তাদের উপযোগী ভাষায় চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনার প্রকাশ ঘটায়। এতে আনন্দ, কৌতূহল ও উত্তেজনার উপাদান ব্যবহৃত হয় এবং এটি কোনোভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের সাহিত্যকে সরলীকরণ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রস্তুতকরণের নাম নয়; বরং এটির রয়েছে নিজস্ব নীতি, পদ্ধতি ও শৈলীগত স্বতন্ত্র ধারা। ফলে শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে উচ্চতর দক্ষতা, সুক্ষ্ম রুচি ও বিশেষ শিল্পক্ষমতার দাবি রাখে।[২]

এর অর্থ হলো– সমকালীন ইসলামী শিশুসাহিত্যের সামনে রয়েছে মুক্ত সৃজনশীলতার এক বিশাল দিগন্ত। যার প্রাণশক্তিকে সীমাবদ্ধ করার মতো কোনো কঠোর শর্ত নেই– শুধুমাত্র ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা চায়। শিশুসাহিত্য কোনোভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের সাহিত্যকে সহজ করে শিশুদের সামনে পেশ করার নাম নয়; বরং এটি শিশুদের জগৎ ও তাদের স্বকীয়তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক স্বতন্ত্র সৃজনধারা, যা নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে; যদিও এটি প্রাপ্তবয়স্কদের কলমেই লেখা হয়। শিশুসাহিত্যের অবস্থান অনেকটা শিশু চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো– যা বিশেষজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্করাই পরিচালনা করেন, কিন্তু তা কোনোভাবেই বড়দের চিকিৎসাশাস্ত্রের সরলীকৃত রূপ নয়; বরং শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত শাখা।

আর যদি বলা হয়– শিশুসাহিত্য একটি নতুন পরিভাষা, যা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, চিন্তা বা সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে পাওয়া যায় না! তাহলে এর মানে এই নয় যে, এটি ইতিহাসে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। বিষয়টি পরিভাষাগতভাবে নতুন হলেও সত্তায় নতুন নয়। কোনো কিছুর অস্তিত্বকে শুধুমাত্র তার নাম বা শিরোনাম দিয়ে বিচার করা যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত নয়; আসল বিবেচ্য হলো তার প্রচলন ও বিষয়বস্তু। আমরা দেখি– আমাদের ঐতিহ্যে এমন অনেক লেখা রয়েছে, যা সম্পূর্ণ শিশুদের উপযোগী। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে কুরআনের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবনের নানা ঘটনার সঠিক ও ফলপ্রসূ বিশ্লেষণ করার যে ক্ষমতা শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করতে হয়, কুরআন সেক্ষেত্রে হতে পারে এক অসাধারণ উৎস। কেননা কুরআন গল্পকে গ্রহণ করেছে হেদায়েত ও

---

[১] *আদাবুল আতফাল ফী দুয়িল ইসলাম (ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুসাহিত্য)- নাজীব আল কীলানী, আল জেরিয়া, বাতনা : আল ইসরা ফাউন্ডেশন, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ১৪।*

[২] *কাসাসুল আতফাল : উসুলুহুল ফাননিয়্যাহ ও রুওয়াদুহু (শিশুগল্প : শিল্পধারা ও অগ্রদূত)- আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ মুহসিন, কায়রো : আল আরাবী পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ২৩।*

সূচীপত্র

প্রত্যয়ের বিশেষ মাধ্যম হিসেবে। গল্পের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা মনের ভেতরে প্রবেশ করে, অন্তরকে জাগিয়ে তোলে এবং মস্তিষ্কের কঠোর বাধা ভেদ করে সত্যের বোধকে প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামী শিশুসাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- নবীচরিত ও সাহাবীদের জীবনীনির্ভর ঘটনাবলি গল্পরূপে শিশুদের সামনে তুলে ধরা। রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর তৎকালীন মুসলিম বাবা-মা ও শিক্ষকরা শিশু প্রজন্মের যারা নবীকে প্রত্যক্ষ করেনি; তাদেরকে মহানবীর জীবন, চরিত্র, মু'জিযাহ্, আদর্শ, সংগ্রাম ও অভিযানসমূহের গল্প শোনাতেন। পাশাপাশি ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের দুঃসাহসিক বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতেন, বিশেষ করে যারা ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারে মহানবীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন, শহীদ বা গাজী হয়েছিলেন অথবা মহানবীর তিরোধানের পর দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপ্রচার ও উম্মাহ বিনির্মাণে নিবেদিত ছিলেন, তাদের গল্পকথা শোনাতেন।[১]

সারকথা হলো– কুরআন, সিরাতুন্নবী, মাগাযি সাহিত্যের বর্ণনা, সাহাবীদের বিস্ময়কর বীরত্ব, তাদের দা'ওয়াতি প্রচেষ্টা ও তাওহীদের শুদ্ধ 'আক্বিদাহ্'র প্রতিষ্ঠা– এ সবই ইসলামী সংস্কৃতির ভাণ্ডারে শিশুসাহিত্যের প্রথম বীজ হিসেবে অবস্থান করেছে। নিঃসন্দেহ আরবী ও ইসলামী ঐতিহ্যের অসংখ্য গ্রন্থে শিশুসাহিত্যের বহু মূল্যবান উপাদান রয়েছে। তবে সেগুলোকে চিহ্নিত করা, গ্রন্থিত করা ও বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানোর জন্য বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন, যাতে নবীন পাঠকদের সামনে সুসংহত ও প্রাঞ্জলভাবে তা উপস্থাপন করা যায়। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো– মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল মাক্কি আস সাক্কালি (মৃ. ৫৬৭ হি.) রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আনবাউ নুজাবায়িল আনবা' (গুণীজনদের কাহিনী)।

মুসলিম পরিবার

ইসলামী শিশুসাহিত্যের আলোচনায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য ও গুরুত্ববহ তা হলো 'মুসলিম পরিবার'। শিশুর সুসংহত, ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠন, শিক্ষাদান ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পরিবারই হলো শক্ত দুর্গ। পরিবার নামক এই দুর্গকে প্রতিনিয়ত ঝড়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক বিকৃতিকারক মিশনগুলো নিরলসভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ে পরিবারকে তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরিয়ে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমের সয়লাব এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব সংস্কৃতি বিকৃতিকারী মিশনগুলোর কাজকে আরো সহজ করে দিচ্ছে। পরিবার ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত এসব মিশন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে, মুসলিম পরিবার হলো এমন এক অপ্রতিরোধ্য দুর্গ এবং সুরক্ষিত আশ্রয়, যেখানে গড়ে ওঠে 'আক্বিদাহ্, জ্ঞান, চিন্তা, আচরণ ও শারীরিক গঠনের সমন্বিত এক মুসলিম প্রজন্ম। এহেন বাস্তবতায় মুসলিম পরিবারের উচিত সন্তানের শিক্ষাদান ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা করা, যাতে আধুনিক ডিভাইস ও গণমাধ্যমের কুপ্রভাব যতটা সম্ভব কমানো যায়।

বর্তমান বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে মুসলিম জনপদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও মিডিয়াকর্মীদের দায়িত্ব হলো– বিষয়ভিত্তিক গবেষণার আলোকে এমন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষত নৈতিকতা ও উম্মাহর সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম। তবে আমার মতে, মুসলিম শিশুকে ইসলামী নৈতিকতার মৌলিক পাঠে সুসজ্জিত করতে, মূল্যবোধ ও আচরণে মুসলিম পরিচয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলিম পরিবার ও শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র। মুসলিমদের অনেকেই শিশুর এমন কিছু আচরণকে সাধারণ বা তুচ্ছ মনে করেন, যেন এগুলোর তেমন কোনো গুরুত্বই নেই। অথচ বাস্তবে এগুলোই হতে পারে ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক আহমদ সালেহ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র বাণীগুলো তুলে ধরা যায়। যিনি মুসলিম শিশুকে সম্বোধন করে বলেন– 'হে বাছা! এমন চিঠি পড়া থেকে বিরত থাকো, যার ঠিকানা তোমার নামে নয়। দরজার আড়ালে কান পাতবে না, জানালার ছিদ্র দিয়ে তাকাবে না– কারণ এগুলো মর্যাদা বিনষ্টকারী কাজ। আর কাউকে দেখতে যেতে চাইলে উপযুক্ত সময় বেছে নেবে, যাতে তোমার আগমন অন্যের কাজে বিঘ্ন না

---

[১] *আদাবুল আতফাল (শিশুসাহিত্য)- আলী আল-হাদীদী, কায়রো : অ্যাংলো ইজিপশিয়ান লাইব্রেরি, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ.২২৬।*

সূচীপত্র

ঘটায়। ঘরে ঢোকার আগে দরজায় হালকা কড়া নাড়বে। যদি শব্দ কম হয় এবং শোনা না যায়, তবে প্রথমবারের তুলনায় একটু জোরে আবার কড়া নাড়বে আর যদি দুই বা তিনবার কড়া নাড়ার পরও দরজা না খোলে– তবে বুঝবে, এই সময়ে সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।'[1]

এসব আচরণ, কারো কারো নিকট তুচ্ছ মনে হলেও বাস্তবে শিশুর নৈতিকতা ও আচরণগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সাধারণ গুণাবলী শিশুর ব্যক্তিত্বে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ইসলামী সাহিত্যে শিশুর মর্যাদা

ইসলাম শিশু প্রতিপালন ও তার সঠিক পরিচর্যার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল। এ সম্পর্কিত নির্দেশনা ও বর্ণনা এত বিপুল যে, এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু মানেই ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ মানেই উম্মাহর সুখ, সাফল্য এবং জীবনের দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করার সক্ষমতা। পণ্ডিতদের ভাষায়– ইসলামে শিশু-স্বার্থরক্ষার বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। শিশুরা ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে যেমন সুখ ও সুরক্ষা পায়, বিশ্বের অন্য কোনো সভ্যতায় তা পায় না। ইসলাম নবপ্রজন্মের প্রতি সর্বোচ্চ মাত্রার গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ, নবপ্রজন্মই ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি।[2]

ইসলামী সাহিত্য হলো ইসলামী 'আক্বিদাহ্ ও নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা। এটি ইসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সমর্থন প্রদানে শক্তিশালী এবং সক্রিয় উৎস। সে কারণেই ইসলামী সাহিত্য শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। শিশুসাহিত্যে সমকালীন ইসলামী সাহিত্যের অবদান ও সৃজনপ্রয়াস সম্পর্কে জানতে চাইলে রিয়াদে অবস্থিত রাবিতাতুল আদাব আল-ইসলামী আল-আলামিয়া (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংঘ)-এর প্রকাশনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন।

ইসলামী শিশুসাহিত্য এখন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি বিশেষায়িত ধারা হিসেবে সুপরিচিত। সমকালীন ইসলামী সাহিত্যের বিস্তৃত আকাশে এটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পরিসর। আরব ও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এমন বহু সৃজনশীল লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা এক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো– নাবিলা আল-খাতিব, হিসসা আল-আওয়াদি, সালিম আব্দুল কাদির, আব্দুল্লাহ আল-খালিদ, আব্দুর রাজ্জাক হুসাইন, খাইরুদ্দীন ওয়াইলি, মুহাম্মদ আল-আখদার আস-সায়িহি প্রমুখ।

এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো মানসম্মত শিশুপত্রিকার সংকট। মুসলিম বিশ্বের বহু দেশে শিশুদের উপযোগী, বিশেষায়িত ও মানসম্পন্ন পত্রিকার সংখ্যা অপ্রতুল। কিছু দেশে তো কার্যত উল্লেখযোগ্য কোনো শিশুপত্রিকাই নেই। তবে ন্যায়বোধের জায়গা থেকে এ মঞ্চে প্রশংসনীয় দু'একটি শিশুপত্রিকার নাম উল্লেখ করতে হয়, তা হলো– কুয়েতের ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বারায়িমুল ঈমান, জাতীয় সংস্কৃতি, কলা ও সাহিত্য কাউন্সিল প্রকাশিত আল-আরাবি আস-সাগির এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবূ ধাবি মিডিয়া প্রকাশিত শিশুপত্রিকা মাজিদ।

আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা– আরব ও মুসলিম বিশ্বের সব ওয়াকফ ও ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের সাহিত্য, রুচি ও প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। কাগজে ও ডিজিটাল– উভয় মাধ্যমেই বিশেষায়িত পত্রিকা ও প্রকাশনা চালুর উদ্যোগ নেবে, যা শিশুদের মানসিক বিকাশ, ঝোঁক- প্রবণতা, কল্পনা ও জ্ঞানপিপাসার প্রতিটি দিককে সমান গুরুত্ব দেবে। এ প্রচেষ্টার মৌলিক লক্ষ্য হবে দু'টি– **প্রথমতঃ** আধুনিক যোগাযোগপ্রযুক্তি থেকে উৎসারিত বিপুল তথ্যপ্রবাহের নেতিবাচক সাংস্কৃতিক কুপ্রভাব থেকে শিশুদের কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। **দ্বিতীয়তঃ** শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা আগামী দিনের দৃঢ়চিত্ত, ঈমানদীপ্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও সাংস্কৃতিকভাবে সুরক্ষিত নাগরিক হিসেবে সমাজ, ধর্ম, দেশ ও উম্মাহর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে– নিয়তি তাদেরকে পৃথিবীর যেখানেই নিয়ে যাক না কেন। ☒

---

[1] *আল্লিমুল আতফাল মা ইয়াফআলুনাহু ওয়া হুম রিজাল (শিশুদের শিখিয়ে দাও– বড় হয়ে তারা যা করবে)- আহমদ আফেন্দি সালেহ, মিসর : আল-মাতবাআ আল-আমিরিয়া), পৃ. ১৭-১৮।*

[2] *আদাবুল আতফাল : আহদাফুহু ওয়া সিমাতুহু (শিশুসাহিত্য : লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য)- মুহাম্মদ হাসান বুরাইগিশ, বৈরূত : মুওয়াসাসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৮।*

দাফন ও দাফনের পর করণীয়

–জান্নাতুল মহল★

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

পৃথিবীর জীবনকে কুরআনে বলা হয়েছে ‘হায়াতুদ্দুনিয়া’। এই জীবনের অবসান ঘটে দৈহিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। দেহ থেকে রূহ্ বা জীবনকে আলাদা করে ফেলা হয়। এর ফলে দেহের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু প্রতিটি জীবের জন্য অবধারীত। মৃত্যু থেকে পালাবার কোনো সুযোগ বা পথ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ﴾

“প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।”[১]

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ﴾

“প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করত হবে। আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি। আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।”[২]

﴿وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾

“আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন (এবং ক্রমশ বাড়িয়ে তোলেন যেমন বাড়িয়ে তোলেন বৃক্ষকে), অতঃপর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন এবং তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।”[৩]

মৃত্যুর পর মৃতের জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক কর্ম থাকে। **আনুষ্ঠানিক কর্মগুলো–**

গোসল, কাফনের কাপড় পড়ানো, জানাযার সলাত আদায় ও সব শেষে দাফন : এই কর্মগুলো অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক হতে হবে। তাহলে মৃতব্যক্তি এবং মৃতের জন্য যারা তা আদায় করবেন সবাই তার সওয়াব পাবে, আর তা না হলে যদি তা বিদ‘আতী (ভুল) পদ্ধতিতে হয় তাহলে উভয়েই গুনাহগার হবে।

আসুন, গুনাহ থেকে বাঁচাতে সঠিক তথ্য জেনে সঠিক পদ্ধতিতে মৃত্যু সংক্রান্ত ‘আমল দাফন সম্পাদন করে আমরা ‘আমলে স্বলেহীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে সচেষ্ট হই।

১. কবর বেশ গর্ত, প্রশস্ত ও সুন্দর করে তৈরি করা : দাফন অর্থ মৃতকে কবরস্থ করা। দাফনের উদ্দেশ্য হলো– এমন একটি গর্তে মৃতদেহকে ঢেকে দেওয়া, যা তার দুর্গন্ধ ছড়াতে দেবে না এবং পশু ও পাখিকে তার কাছে যেতে দেবে না। যেভাবে দাফন করলে এই উদ্দেশ্য সফল হবে, তাতে ফর্য আদায় হবে ও কর্তব্য পালিত হবে। তবে মাথা সমান গভীর কবর খনন করা বাঞ্ছনীয়। ইবনে আবি শায়বা ও ইবনুল মুনযির ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘উমার (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন : কবর মাথা বরাবর গভীর ও প্রশস্ত করো। আর আবূ হানীফাহ্ ও আহমদের মতে, মানব দেহের অর্ধেক পরিমাণ গভীর করবে। আরো বেশি করলে উত্তম।

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, ‘কবরের গভীরতার কোনো সীমা নেই।’[৪]

নবী করীম (ﷺ) ওহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, ‘তোমরা কবর খনন করো। তোমরা কবরকে প্রশস্ত, গভীর এবং সুন্দর করো’।[৫]

অতএব, রাসূল (ﷺ)-এর সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী কবর গভীর করতে হবে এবং তা অধীক গভীর হওয়াই উত্তম। রাসূলের এই নির্দেশের উপর ‘আমল না করে আমাদের সমাজে প্রচলিত কবরকে তিনহাত দৈর্ঘ্য আর সাড়ে তিনহাত গভীর করা হয়, যা কোনো হাদীসেই বর্ণিত হয়নি এমন ‘আমল করা উচিৎ নয়।

২. মৃতকে কিভাবে কবরে ঢুকাবে : মৃতকে কবরে প্রবেশ করানোর সুন্নতী নিয়ম হলো– সম্ভব হলে তার দেহের শেষ ভাগ অর্থাৎ- নিম্নাংশ আগে ঢুকানো। কেননা আবূ দাঊদ, ইবনু আবী শায়বা ও বায়হাক্বী ‘আব্দুল্লাহ ইবনু

★ *দাঈ‘ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *সূরা আল-‘আনকাবুত : ৫৭।*

[২] *সূরা আর-‘আম্বিয়া- : ৩৫।*

[৩] *সূরা আন্-নুহ : ১৭-১৮।*

[৪] *শাওকানী নায়লুল আওত্বার- ৫/৯৪ পৃ., আন্ নাসায়ী- ২০১০।*

[৫] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৬৩০০; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৭১৩; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২১৫।*

সূচীপত্র

যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ একজন মৃতকে তার পায়ের দিক দিয়ে কবরে ঢুকালেন এবং বললেন এটাই সুন্নতি নিয়ম। এটা সম্ভব না হলে যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই ঢুকাবে।[১]

৩. মৃত ব্যক্তিকে কবরে কে নামাবে : মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়রাই তাকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পালন করবে।[২]

৪. মৃতকে কবরে রেখে তার মুখ কেবলার দিকে ফেরানো : সুবিদিত সুন্নত হলো– মৃতকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো। আর তার মুখ কেবলার দিকে ফেরানো। চেহারা ও তার দু’ পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতে হবে। কারণ, রাসূল (ﷺ)-এর যুগ হতে অদ্যাবধি এরূপ ‘আমলই হয়ে আসছে। বর্তমানে আরব দেশগুলোতে এভাবেই ‘আমল হয়ে আসছে। অথচ দুঃখজনক আমাদের দেশে এর উপর ‘আমল না করে চিত করে শুইয়ে দিয়ে মুখটি কেবলার দিকে কাত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পাঠকবৃন্দ! এখন হতে সুন্নতি পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা শুরু করুন।[৩]

৫. মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার দু‘আ : যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে রাখবে, সে এই দু‘আ পড়বে–

«بِسْمِ اللّٰهِ، وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ». «بِسْمِ اللّٰهِ، وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ».

উচ্চারণ : “বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ” বা “ওয়ালা আ’লা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ”।

অর্থ- “আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরিকার উপরে” অথবা “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ মোতাবেক তাকে কবরস্থ করছি”। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হবে তখন নবী (ﷺ) এই দু‘আ বলতেন।[৪]

এই দু‘আ বলে কাফনের বাধন খুলে দেবে।

৬. কবরে তিন মুঠো মাটি দেয়া মোস্তাহাব : যারা দাফনের কাজে শরিক হবে, তাদের প্রত্যেকের দু’হাত দিয়ে তিন মুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দেয়া মোস্তাহাব। এই মাটি মৃত ব্যক্তির মাথার দিক থেকে ছড়াতে হয়। কেননা ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনৈক মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। তারপর তার কবরে এসে তার মাথার দিক দিয়ে তিন মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিলেন।[৫]

আমরা অনেকেই মাটি দেওয়ার সময় যে দু‘আ পাঠ করি *(সূরা ত্ব-হা- : ৫৫)* তা পাঠ করা সঠিক নয়। কারণ, এর অর্থের দিকে খেয়াল করুন, মানুষ বা সৃষ্টজীব হিসাবে এটা বলা কি ঠিক? যেমন-

১. স্রষ্টা হিসাবে এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

“এ (মাটি) থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তা থেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।”[৬]

২. কবরে কুরআন পাঠ করা : কবরে কুরআন পাঠ করা নিষেধ।[৭] আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কখনো পাঠ করেননি। পাঠ করতেও বলেননি। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ﴾

“তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না, আর বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবে না (বিশেষতঃ) যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।”[৮]

৩. দাফনের সময় দু‘আ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ﴾

“আর জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান; যারা কবরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পার না।”[৯]

দাফনের সময় উক্ত দু‘আ পাঠ করা যাবে না। পাঠ করার মর্মে বর্ণিত যে হাদীস তা য‘ঈফ।[১০]

৭. দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা (খুবই জরুরি) : কিবলামুখ হয়ে দু’হাত তুলে একককভাবে দু‘আ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[১] *সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ৩২১১।*

[২] *আহকামুল জানায়েয- মাসআলা নং- ৯৭।*

[৩] *আহকামুল জানায়েয- মা. নং ১০১।*

[৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৭৯৭, ৪৯৭০; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১০৪৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৫০, ১৫৫৩, সহীহ।*

[৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৬৫।*

[৬] *সূরা ত্ব-হা- : ৫৫।*

[৭] *বুখারী- হা. ২৬৯৭; মুসলিম- ১৭১৮; মিশকাত- হা. ১৪০।*

[৮] *সূরা আন্-নামল : ৮০।*

[৯] *সূরা আল-ফা-ত্বির : ২২।*

[১০] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২২৪১; য‘ঈফ ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : জানাযা, হা. ১৫৫৩।*

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۞ ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

“জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সাথে এবং গোপনে আহ্বান করো, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।”[১]

মৃত ব্যক্তির দাফন সমাপ্ত হলে উপস্থিত সবাই **কবরের নিকট কিছু সময় দাঁড়িয়ে** তার জন্য–

১) ক্ষমা প্রার্থনা করো– “হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। তার জানা-অজানা, ছোট-বড় সকল অপরাধ ক্ষমা করুন” এবং

২) দু‘আ করো– “হে আল্লাহ! তার সওয়াল-জবাব সহজ করুন। তাকে ঈমানের উপর অবিচল রাখুন। তার কবর আলোকিত করুন। তার কবর ‘আযাব মুক্ত করুন। তাকে কবরের নিরাপত্তা দিন, তাকে জান্নাত দান করুন।”

এভাবে দু‘আ করার জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন। কেননা এই অবস্থায় মৃত ব্যক্তি এটাই কামনা করে। ‘উসমান (রযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) দাফন সমাপ্ত করে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন, আর সাহাবীদের বলতেন, “তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য ক্ষমা চাও এবং তার জন্য ঈমানের দৃঢ়তা চাও। কেননা তাকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।”[২]

মৃত ব্যক্তির দাফন সমাপ্ত হলে উপস্থিত সবাই কবরের নিকট দাঁড়িয়ে এককভাবে দু‘আ করবে। সম্মিলিতভাবে দু’হাত তুলে দু‘আ করার কথা কিন্তু হাদীসে নেই; বরং সকলের প্রতি তার নির্দেশ ছিল পৃথক পৃথকভাবে দু‘আ করা। অথচ আমাদের দেশে এ সময় সম্মিলিতভাবে দু‘আ করা হয়। ইমাম দু‘আ করেন পিছনে সবাই আমীন, আমীন বলেন। যা উপরের হাদীসের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাহলে নিজেই দু‘আ করতেন আর বাকিরা আমীন, আমীন বলতেন। তাহলে এভাবে নির্দেশ দিতেন না।

৩) সুনান আবূ দাঊদ ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, **এই সময় মৃত ব্যক্তির জন্য নিচের দু‘আগুলো বার বার পড়া উত্তম**। যেমন-

১- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ.

উচ্চারণ : ‘আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়াসাব্বিতহু।’

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে (প্রশ্নোত্তর ও ঈমানের উপর) অটল রাখুন।’[৩]

২- "اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ".

উচ্চারণ : ‘আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।’

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’[৪]

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ».

‘আল্লা-হুম্মাগফির লিআবী সালামাতা ওয়ারফা‘ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়িইনা, ওয়াখলুফহু ফি আক্বিবিহি ফিল গবিরীনা, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহু ইয়া রব্বাল আ-লামীন, ওয়াফসাহ লাহু ফি কাবরিহী ওয়া নাব্বির লাহু ফিহি।’

‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎসমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন।’[৫]

৪) জানাযার সলাতে পঠিত দু‘আগুলোও বারবার পড়ে মাইয়্যেতের জন্য দু‘আ করবে। বিশেষ করে প্রথম দু‘আটি, যেখানে মাইয়্যেতের জন্য চাওয়া-পাওয়ার সবকিছুই আছে। এভাবে বিনীত হয়ে বারবার আল্লাহর নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।

৫) যারা দু‘আ জানে না তারা **নিজ নিজ ভাষায় আন্তরিকভাবে মাইয়্যেতের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং দু‘আ করবে।**

৩টি সময়ে মৃত ব্যক্তির দাফন করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। যথা- ⇨ সূর্য উদয়ের সময়, দুপুরে যখন সূর্য মাথার উপরে আসবে, ⇨ যতক্ষণ তা ঢলে না পড়ে এবং ⇨ যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার নিকটবর্তী হয়, যতোক্ষণ তা ডুবে না যায়। এই তিন সময় মৃতদের দাফন করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ।[৬] ☒

---

[১] *সূরা আর-আ‘রাফ : ৫৪-৫৫।*

[২] *আবূ দাঊদ- হা. ৩২২১; বাইহাক্বী- ৪/৫৬; হাকিম- ১/৩৭০।*

[৩] *সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ৩২২১; মিশকাত- হা. ১৩৩, সহীহ।*

[৪] *সহীহ আবূ দাঊদ- অধ্যায় : জানাযা, হা. ৩২০২।*

[৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭/৯২০।*

[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৩১।*

ক্বাসাসুল হাদীস

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র তিন প্রশ্ন ও ইসলাম গ্রহণ

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি মদীনার ইহুদি গোত্র বানু কায়নুকার লোক। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আল-হুসায়ন। উপনাম আবূ ইউসুফ। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নাম রাখেন ‘আব্দুল্লাহ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইউসুফ (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধর। তাঁর পিতা সালাম একজন ইহুদি ধর্মজাযক ছিলেন। তিনি নিজেও এ ধর্মের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল কিতাবে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিলেন। এ হিসেবে তাঁকে আনসার সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদিনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর নিকট আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই যার উত্তর নবী ব্যতীত আর কেউ জানে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? আর সর্বপ্রথম খাবার কী, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কী কারণে সন্তান তার পিতার মত হয়? আর কী কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের মতো হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই মাত্র জিব্রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, সে তো ফেরেশ্তাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হবার ব্যাপার এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সদৃশ হয়। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ইয়াহূদীরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কছে আমার কুৎসা রটনা করবে। অতঃপর ইয়াহূদীরা এলো এবং ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি ‘আব্দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কী হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে রক্ষা করুক। এমন সময় ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক এবং সবচেয়ে খারাপ লোকের সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লেগে গেল।[৯২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, তখন মদীনায় প্রচার হলো মহান আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসেছেন। লোকেরা উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল আর উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসেছেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরাবর সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। অবশেষে আবূ আইয়্যুব আনসারীর বাড়ীর নিকটে এসে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়্যুব আনসারী তখন তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের খবর শুনতে পেলেন।

তিনি এ সময়ে তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। খবর শুনেই তিনি পাড়া খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তা সাথে করেই নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চলে আসলেন এবং নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখনিঃসৃত কিছু কথাবার্তা শুনে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের লোকদের মধ্য কার বাড়ী এখান থেকে অধিকতর নিকটে। আবূ আইয়্যুব আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি অধিক নিকটে। এই যে আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা। তিনি বললেন, যাও, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো।

[পরবর্তী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

---

[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩২৯, আধুনিক প্রকাশনী, হা. ৩০৮৩, ই. ফা. বাং, হা. ৩০৯১।*

বাংলাদেশ ও ভূমিকম্প

–ফয়সাল আহমেদ[*]

পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরে কোনো কারণে (তাপ ও চাপের তারতম্যজনিত) দ্রুত বিপুল পরিমান শক্তি মুক্ত হওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠে সংঘটিত আকস্মিক ও অস্থায়ী ঝাঁকুনি বা কম্পনের নাম ভূমিকম্প। 'An earthquake is a shaking of the earth crust.' ভূ-অভ্যন্তরস্থ শিলারাশিতে সঞ্চিত শক্তির আকস্মিক অবমুক্তির কারণে সৃষ্ট এই স্পন্দনের মাত্রা মৃদু কম্পন থেকে প্রচণ্ড ঘূর্ণনের মধ্যে হতে পারে। ভূমিকম্প হচ্ছে এক ধরনের তরঙ্গ শক্তি যা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভুত হয়ে প্রচণ্ড গতিতে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক-দুই মিনিট পর্যন্ত ভূমিকম্প স্থায়ী হতে পারে। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগ নয়। পৃথিবী সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এটি হচ্ছে এবং যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন-ই হতে পারে। এই প্রাকৃতিক দূর্যোগের কাছে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। শুধু ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর চেষ্টা ছাড়া মানুষের প্রকৃতপক্ষে করার কিছুই নেই। তাই বিশ্বব্যাপী আজ বড় চিন্তা-ভাবনা হলো কিভাবে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রাকে সর্বনিম্ন করা যায়। বাড়ানো হচ্ছে ভূমিকম্পের সময় করণীয় ও জনসচেতনতা। নগর সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে ভূমিকম্পরোধী বিল্ডিং কোড, অব্যাহত রাখা হয়েছে ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পাওয়ার প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হলেও এই কম্পনের গতি, প্রকৃতি ও মাত্রা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা খুবই অপ্রতুল। পৃথিবী কতগুলো প্লেট বা পাত দ্বারা সংঘটিত- ইন্ডিয়ান প্লেট তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটের একটি অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর আগে বার্মিজ প্লেট এবং উত্তরে তিব্বতিয়ান প্লেট; যা ইউরেপিয়ান প্লেটের অংশ। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ায় কৌণিকভাবে বার্মিজ এবং তিব্বতিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে। ফলে পূর্ব দিকে ইন্ডিয়ান প্লেট দেবে যাচ্ছে বার্মিজ প্লেটের নিচে এবং বার্মিজ প্লেট ওপরে ওঠায় আরাকান ইয়োমা পর্বত শ্রেণির সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি এলাকাসমূহ আরাকান-ইয়োমা পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত। আবার উত্তর দিকে ইন্ডিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দেয়ায় হিমালয় পর্বতশ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি দু'টি প্লেটের সংযোগস্থলে। বাংলাদেশের পূর্বে ইন্ডিয়ান ও বার্মিজ প্লেটের সীমানা বরাবর এবং উত্তরে ইন্ডিয়ান ও তিব্বতিয়ান প্লেটের সীমানা বরাবর ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলগুলোর (Epicentre) অবস্থান। ইন্ডিয়ান প্লেট অন্য দু'টি প্লেটকে ধাক্কা দেয়ায় প্লেটগুলোর সীমানা বরাবর শক্তি সঞ্চয় হতে থাকে। এই জমাকৃত শক্তির যখন ভারসাম্য নষ্ট হয় তখন পরস্পর সংঘর্ষের ফলে ইন্ডিয়ান প্লেট বার্মিজ বা তিব্বতিয়ানর প্লেটের নিচে দেবে যায় এবং অবমুক্ত শক্তির দ্বারা ভূ-কম্পন শুরু হয়। এই কম্পন তরঙ্গ মাটির ভেতর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাটি শক্ত হলে ভূমিকম্পের তরঙ্গ অতিদ্রুত সঞ্চালিত হয় এবং ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়। অন্য দিকে মাটি নরম হলে ভূমিকম্পের তরঙ্গও মন্থর হয়, কম্পন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ক্ষয়-ক্ষতি অনেক বেশি হয়।

বাংলাদেশ উচ্চ ভূ-কম্পনশীল অঞ্চলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার মধ্যে রয়েছে উত্তরের হিমালয়ান আর্ক ও শিলং মালভূমি, পূর্বে জটিল নাগা সিডাং হাফলং ঘাত অঞ্চল। এটি অসংখ্য অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠ সক্রিয় চ্যুতি (Active Fault) ও হিনজ জোন নামে পরিচিত একটি ভগ্ন অঞ্চলসহ বৃহৎ ডাউকি চ্যুতি অঞ্চল। ভূ-গাঠনিক দিক থেকে দুর্বল এসব অঞ্চল অববাহিকার এলাকার মধ্যে শিলা চলাচলের প্রয়োজনীয় স্থান সঙ্কুলান করে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের সাধারণীকৃত ভূ-গাঠনিক মানচিত্রে মূল কেন্দ্রসমূহের বন্টন ডাউকি চ্যুতি ব্যবস্থা বরাবর এক রেখায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়।

মানচিত্রের অনুসন্ধানে দেখা যায়, মূল কেন্দ্রগুলো অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠ চ্যুতিতে গঠিত দূর্বল অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার কম্পনগুলো মাঝারি মানের (m = 4-6) এবং কম গভীরতায় অবস্থিত যা ভিত্তি শিলায় অধিশায়িত অবক্ষেপে সাম্প্রতিক বিচলনের ইঙ্গিতবাহী। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অংশে (সুরমা বেসিন) গুরুত্বপূর্ণ কম্পনগুলো ডাউকি চ্যুতিব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মধুপুর সোপানস্তুপের ভেতরে ও আশেপাশে সংঘটিত কম্পনসমূহ পলল থেকে স্তুপকে পৃথককারী চ্যুতির অগভীর স্থানান্তরের ইঙ্গিতবাহী। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তরের এলাকাগুলো ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় ভূ-কম্পন বলয়ে অবস্থিত। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে প্রায়শ ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। তবে এই কম্পনের মাত্রা দেশের সর্বত্র সমভাবে অনুভূত হয় না। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে বিশেষজ্ঞরা সংশোধিত ভূ-কম্পন মানচিত্রে বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। যথা-

অঞ্চল- ১ : এটি দেশের ভূ-কম্পের দিক থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে– দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো।

---

[*] *প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, এম.জি.আই.এল.আই.।*

অঞ্চল- ২ : এটি ভূমিকম্পের দিক থেকে মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে– চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুর অঞ্চল।

অঞ্চল- ৩ : এটি দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্পনপ্রবন এলাকা বলে বিবেচিত। এই এলাকার মধ্যে রয়েছে– রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশ।

২০০৯ সালের ২১ ও ২৩ সেপ্টেম্বর রিখটার স্কেলে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকা শহর। এটির উৎপত্তি ছিল মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায়, যা ঢাকা শহর থেকে ৫৫২ কিলোমিটার দূরে ছিল। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে পরপর (রাত ১০ : ৪০ মিনিট ও রাত ১১টা ৪৪ মিনিট) বুধবার ৪.৬-৪.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকা শহর কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঢাকা শহরের মানুষ। যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা শহরের খুবই কাছে। প্রথমটি চাঁদপুর এবং দ্বিতীয়টি ছিল গোপালগঞ্জে। সম্প্রতি ভূমিকম্পে শুধুমাত্র ঢাকা শহর নয়, যা দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় কম্পনের সৃষ্টি করে নারায়ণগঞ্জের দু'টি বহুতল বিশিষ্ট ভবনে ফাটল সৃষ্টি করে। শঙ্কার বিষয় হলো অতীতের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কেউ কেউ বলছেন ঢাকার নিকটবর্তী মধুপুরে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল (এপি সেন্টার) আছে। অন্য দিকে এপি সেন্টারের কাছাকাছি হওয়ায় সিলেট ও চট্টগ্রাম আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ। ১০ সেপ্টেম্বর ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ সারা দেশব্যাপী যে ভূমিকম্প হয় তার উৎপত্তি ছিল কিন্তু ডাউকি চ্যুতি বা মধুপুরে ছিল না, সম্পূর্ণ আলাদা জোনে এর উৎপত্তিস্থল ছিল। এর থেকে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে, পুরো বাংলাদেশটাই কম বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। তবে এ ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তরের এলাকাগুলো ভূমিকম্পের কেন্দ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এই এলাকা সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত দূরে থাকার কারণে অন্য দু'টি এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি কোনো এপি সেন্টার না থাকায় (মধুপুর এপিসেন্টারের কথা বলা হলেও সেটা নিয়ে মতভেদ আছে) স্বল্পমাত্রার ভূ- কম্পনে ঢাকার তেমন কোনো ঝুঁকি নেই। এদিক থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম শহর এপি সেন্টারের সন্নিকটে হওয়ায় ঝুঁকির মাত্রা বেশি। অনেকের অভিমত রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার অধিক ভূমিকম্প ৩০ সেকেন্ডের অধিক স্থায়ী হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট শহরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। প্রত্যেকটি শহরই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। তবে এ কথা অবলীলায় বলা যায়, যদি বাংলাদেশের কোথাও রিখটার স্কেল ৬ মাত্রার অধিক ভূমিকম্প হয় তবে ক্ষয়ক্ষতি হবে ব্যাপক। ভূমিকম্প যেহেতু সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটি বিষয় সেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে বলার কোনো উপায় নেই যে কোন এলাকা বেশি ঝুঁকিতে আছে এবং কোন এলাকা কম ঝুঁকিতে আছে। যেমন- বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ঝুঁকিমুক্ত এলাকা বলা হলেও সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, মাগুরা, গোপালগঞ্জসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঝারি মাত্রার ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে এবং যার উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তরপূর্ব অঞ্চলের বাইরে চাঁদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে ভূমিকম্প একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বিষয় যা মানুষের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারের বাইরে।

রাজধানী শহর ঢাকা বিপুল জনসংখ্যা আর অপরিকল্পিত ঘরবাড়ির এক জীর্ণ নগরী। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে কাছাকাছি ভূ-কম্পনের কেন্দ্রস্থল না থাকায় ঢাকা শহর তেমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া অতীতেও ঢাকায় বড় কোনো ভূমিকম্পের নজির নেই। তবে যেহেতু ভূমিকম্প সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটি ঘটনা এবং পরপর দুই বছর একই সময়ে (সেপ্টেম্বর মাসে) ঢাকা শহরে ভূমিকম্প হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে একে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে এবং বিল্ডিং কোড না মেনে অসংখ্য বহুতল ভবন তৈরি করায় ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানলে ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহরের অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হবে তা অনস্বীকার্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে মারাত্মক ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে আছে বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পগুলো জানান দিচ্ছে খুব শিগগিরই উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প হবে এ অঞ্চলে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-কম্পন বিষয়ক গবেষণা ও ভূ-তত্ত্ববিদদের মত অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় ভূ-কম্পন বলয়ে অবস্থিত। ইরানের তেহরান শহরের পরই ঢাকার অবস্থান। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগ বিশ্বের ২০টি ভূমিকম্পপ্রবণ শহরের তালিকা তৈরি করেছিল। তার মধ্যে ঢাকা ছিল অন্যতম।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি খুবই অপ্রতুল। প্রলয়ঙ্করী এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখন থেকেই যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে জনগণের মধ্যে ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে সচতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়জনীয় সকল ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসার শিক্ষক এবং মাসজিদের ইমামদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। গঠন করা যেতে পারে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোতে আগে থেকেই ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শহর এলাকায় বিল্ডিং কোড মেনে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে বাধ্য করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভয়াবহ ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করুন –আমীন।

[পুনঃপ্রকাশ]

৬৭ বর্ষ ॥ ০৭-০৮ সংখ্যা ❖ ২৪ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ জমাদিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সমাজচিন্তা

পরিবারের কাঠামো : একক বনাম যৌথ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা

–মুহাম্মদ আব্দুল হাই*

পরিবার মানব ইতিহাসের প্রথম ভিত্তি। সমাজ, রাষ্ট্রের প্রথম স্তর। মানবশিশুর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তার বেড়ে উঠা সামগ্রিক জীবনকে প্রতিফলিত করে এই পরিবার। পরিবার থেকেই পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের মধ্যে বিকশিত হয় রাষ্টের। সমাজ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন মূলতঃ নির্ভরশীল পরিবারের সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপর। পারিবারিক জীবন অসুস্থ, অশান্তিময় বা নড়বড়ে হলে তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে, তৈরি হয় সামাজিক জীবনে অশান্তি ও নানারূপ উপদ্রপের। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি গুহাবাসীদের জীবনেও পরিবারের মেলবন্ধন ছিল। তখন বরং যৌথ পরিবারকেই তারা বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন মনে করতো। আর বর্তমান সময়েতো পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। বলা হয়ে থাকে পরিবার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষালয়। 'একটি সুদৃশ্য মনোরম অট্টালিকার স্থায়িত্ব যেমন তার মজবুত ভিত্তির উপর নির্ভরশীল, তেমনি পরিবার ও সমাজের সুসংঘবদ্ধ দৃঢ়তার উপরই রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।[৯৩]

তবে, আজকে খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, এই পারিবারিক কাঠামোর আদিরূপটির অস্তিত্ব অনেকাংশেই হুমকির সম্মুখীন। একটা সময় ছিল, পরিবার বলতে বৃহৎ জনসমষ্টির উপস্থিতিকে মনে করা হতো। যেখানে একই সঙ্গে মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচী, ভাই-বোন যুক্ত ছিল।

সুবিধাসমূহ– যৌথ বা বড় পরিবারে কিছু কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও মূলতঃ সেগুলো সামাজিক জীবনে খুব একটা প্রভাব ফেলে না। যান্ত্রিক জীবন ও মানসিক সঙ্কটের অস্থিরতা সেখানে নেই। পারিবারিক বন্ধন সেখানে অনেক মজবুত। পরিবারে প্রত্যেকটি সদস্য একজন আরেকজনের কাছে এক একটি ভরসার নাম, নির্ভরতা আস্থার প্রতিক। পরিবারে দাদা, বাবা, চাচারা সেখানে উপার্জনক্ষম। দাদী, মা, চাচী, ফুফুরা সেখানে অভ্যন্তরীণ ভরসার নাম। আর ছোট্ট ছোট্ট শিশু সোনামনিরা সেখানে ফুলবাগিচার ফুলের ন্যায়। গোটা পরিবারকে আনন্দময়, উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত রাখতে তাদের একটুখানি মিষ্টি হাসি, ছোটখাটো দুষ্টমিই যথেষ্ট। যৌথ পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসা অনেক নারী-পুরুষই নতুন করে এর সুবিধাসমূহ উপলব্ধি করছেন।

'আমাদের ছোটবেলাটা অন্যরকম ছিল। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিগুলো সব ছোটবেলার। আমরা সব ভাইবোন আর চাচাদের ছেলেমেয়েরা একসাথে এক বাড়িতে এক ছাদের নিচে বেড়ে উঠেছি। 'আমার' বলে কিছু ছিল না। সব ছিল 'আমাদের'। দাদা ছিলেন পরিবারের প্রধান। আমরা কি পড়ব, কি করব- সবকিছু মা-বাবা দাদার সঙ্গে ঠিক করে করত। আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই পরিবেশ পেলনা। বলছিলেন বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা তানজিবুল আলম। এ শুধু তার একার উপলব্ধিবোধ না। এ অনুভূতি অধিকাংশ মানুষেরই, যদিও প্রকাশভঙ্গিতে তা অন্যরকম।

তবুও একক পরিবার, নির্মম বাস্তবতার নাম : যৌথ পরিবারের এমন সুখময় মেলবন্ধনকে স্বীকার করেও মানুষ আজ নিরুপায় যেন। বাস্তবতা যে তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। যেখানে টিকে থাকার লড়াইটা একটা স্বস্থির নাম, সেখানে জীবনের সুখময় বাস্তবতা খোঁজার সময় কই। তাই যেনো, যৌথ পারিবারিক কাঠামো ভেঙে একক পরিবারের মাঝেই এখন মানুষ স্বস্তি খুঁজছে, স্বাধীনতা খুঁজছে। কিন্তু সত্যিই কী মিলছে স্বস্তি, স্বাধীনতা? এমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সঠিক কোনো উত্তরও মিলছে না সহজে। বিশেষ করে 'মায়ের হাতে সন্তান খুন', 'পরকীয়ার জের ধরে সন্তান, স্বামীকে খুন, সংবাদপত্রের পাতায় এসব ঘটনা যান্ত্রিক জীবন ও মানসিক সংকটে অস্থির মানুষের কথাই তুলে ধরছে। সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়ে ভোগী ও স্বার্থবাদী হয়ে উঠছে মানুষ। তাই প্রাণপ্রিয় সন্তানকেও সেই ভোগী

সাবেক সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শুব্বান, প্রভাষক (ইংরেজি বিভাগ), পহরচাঁদা ফাযিল মাদরাসা, কক্সবাজার।

[৯৩] *পরিবার ও পারিবারিক জীবন- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ই. ফা. বাং, এপ্রিল-২০০৪, পৃ. ৩১।*

জীবনের বাধা হিসাবে মনে করছে স্বার্থপর মন। আধুনিক ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এসে মানুষে মানুষে 'সম্পর্কের' বিষয়টি এক নতুন ধারণা নিয়ে সামনে আসছে। সবচেয়ে বিশ্বাসের, সবচেয়ে নির্ভরতার সম্পর্কগুলোও যেন অপরিচিত আদল নিয়ে সামনে দাঁড়াচ্ছে।

কেন এই অস্থিরতা : এখন আমরা একটি প্রশ্নের বাস্তবমূখী কিছু কথা শুনবো। তাহলো পরিবারের মতো এই বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেনো এই অস্থিরতা, অবিশ্বাসের ঘুণ। উত্তর হলো, আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে ছুটছি ঠিকই, কিন্তু সঠিক গাইড লাইনকে উপেক্ষা করেই। কিছুটা অবহেলাতো বটেই। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক ড. মোহিত কামাল বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা অসামাজিক হয়ে পড়ছে মূলতঃ মা-বাবার কারণে। মা-বাবার সুস্থ সম্পর্ক না থাকা, শিশুদের সামনে ঝগড়া করা, পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে বাড়ির স্বাভাবিক সম্পর্ক নষ্ট করা। ছেলেমেয়েরা এগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত। আর এই জাতীয় সমস্যা মিটানোর মতো উপর্যুক্ত কোন অভিভাবকের অভাব এই সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। উপরন্তু, কর্মজীবী পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের নিজেরা সময় না দিয়ে ডে কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করে দেন। বিষয়টা অনেকটাই মায়ের চেয়ে মাসির দরদের মতো। এটা সাময়িক একটা সময় পার করা হতে পারে। কিন্তু এভাবে শিশুটির চরিত্র তৈরি হবে না। তাই মা-বাবাকেই সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হবে। খেলার সুযোগ না থাকলে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে আত্মীয়-বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাওয়া। এটা করলেও বাচ্চারা সামাজিকতা শিখবে। সেখানে অন্য বাচ্চাদের সম্পর্কে মিশে যেমন তাদের সহ্য ক্ষমতা বাড়বে তেমনি মা-বাবদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার পরিমিতিবোধ ভদ্র আচরণ দেখেও তারা শিখবে। কিন্তু এসব আড্ডায় বড়রাও খুব একটা নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন না। সবচেয়ে বড় কথা শিশুর বেড়ে উঠবার কালে পারিবারিক আবহের মধ্যে রাখতে হবে। তাহলে সে মানবিক হবে। এগুলোর অভাবই তাদেরকে অস্থির করে তোলে।

এটা এখন সবারই জানা যে, ভেঙে যাচ্ছে যৌথ পরিবারগুলো। সবাই তা মেনেও নিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা আর্থিক সচ্ছলতা পেলে, বিয়ে করলে আলাদা সংসার করবে। পরিবারের মাঝে সম্পর্ক সুস্থ রাখতে এই কাঠামো এখন স্বীকৃত। বিশ্বজুড়েই স্বীকৃত এই পরিবর্তন। কারণ, ক্ষুদ্র একক পরিবারের স্বাধীনতাই বেশি টানছে মানুষকে। আবার যৌথ পরিবার ভেঙে যারা বের হয়েছিলেন, কয়েক বছর পরে আবার তারাই উপলব্ধি করছেন সেই যৌথ পারিবারিক পরিমণ্ডলটার সুবিধাও ছিল অনেক। বিশেষ করে, শিশুদের মানসিক বিকাশে, মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এক ছাদের নিচে সবাই মিলে বসবাস যে খুব কার্যকর এটা টের পেতে শুরু করেছেন অনেকেই।

পারিবারিক কাঠামোর বিপর্যয়, এক অশনি সংকেত : পৃথিবীতে যতপ্রকার অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর পর্যাক্রমিক বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করলে দেখা যায়, পারিবারিক বিপর্যয়ই এর মূল কারণ। আর, মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দুই হলো পরিবার। আল্লাহর বাণী :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর তাদের উভয় থেকে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ, অতঃপর তাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[৯৪]

মুসলিম জীবনের সর্বাবস্থায় পারিবারিক কাঠামোকেই তাই সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এও লক্ষণীয় যে, মুসলিম জাতির যতগুলো উত্থান সংঘঠিত হয়েছে, সেগুলোর মূলে ছিল পারিবারিক স্থিতিশীলতা, দৃঢ়তা, সুস্থতা ও ইসলামী অনুশাসনের ফল। জাতীয় পূর্ণগঠনের এ সন্ধিক্ষণে তাই এর গুরুত্ব সবাগ্রে। এটি আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো রক্ষার প্রথম দূর্গ। তাই এই দূর্গকে রক্ষা করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদিও একে অন্তসারশুন্য ও দূর্বল করার জঘন্য ষড়যন্ত্রে কাফির, মুশরিকরা উঠে পড়ে লেগেছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা পারিবারিক সন্তান নিয়ন্ত্রণকরণকে গ্রহণ করেছে। এরপর ছড়িয়ে দিয়েছে দুনিয়ার মোহকে, এর প্রতি আকর্ষন হিসাবে লোভজনক পেশাকে। আর চূড়ান্ত ধ্বংসকারী পদক্ষেপ হিসাবে নিয়েছে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষনকে চালু করার বিষয়কে। এই সংক্রামক ব্যাধি পৃথিবীব্যাপী মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার ডাক্তার কিনসে ১৯৪৮ সালে এক গবেষণা রিপোর্ট

---

[৯৪] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

প্রকাশ করে বলেন যে, “আমেরিকার পুরুষদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের অধিক লোকদের মধ্যে এ রোগ অতি সাধারণ হয়ে দাড়িয়েছে। আর ব্রিটেনে তো এই কুকর্মকে আইনসিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে।[৯৫]

এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন- একসময় প্রেম করা নিষিদ্ধ বিষয় বলেই মনে করা হত। প্রেমের বিয়েতে অভিভাবকদের ঘোর আপত্তি ছিল। রীতিমত বনবাসে পাঠানোর মত দূরে সরিয়ে রাখা হত ছেলেমেয়েদের। আর এখন শহুরে জীবনে সম্বন্ধ করে বিয়ে দেয়ার চাইতে ছেলেমেয়েরা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করলেই মা-বাবা বেশি খুশি হন। এটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু তার ফলে, যে সংসারে অশান্তি, দাম্পত্য জীবনে কলোহ বেড়েই চলছে তা আমরা লক্ষ্য করছি না।

দিন দিন সামাজিক রীতিনীতি পাল্টাচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধ বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে সমাজের অনুশাসন, কাঠামো। মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা যত বাড়ছে, জীবন-যাপনের স্বাধীনতাও ততটাই ভোগ করতে চাইছে। পরিবারগুলো ভাঙছে। সমাজও তার আদল বদলাচ্ছে। জীবন-যাপনের পুরনো রীতিগুলোও পাল্টাচ্ছে। মানুষের আশা-আকাংখা, বেড়ে ওঠা সবকিছু ছিল সামগ্রিকভাবে পরিবারকেন্দ্রিক। পরিবারের যে কোন সদস্যের যে কোন চাহিদা পূরণ ছিল রীতিমত পারিবারিক সিদ্ধান্ত থেকে। নিজের সন্তানের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসত পরিবারের প্রধানের কাছ থেকে। দাদা, চাচা, মা, চাচী, চাচাত ভাইবোনরাও সমান অংশীদার ছিল পরিবারের যে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে। পরিবারের যৌথ কাঠামো এই সামাজিক বন্ধন ও নৈতিক বন্ধন দৃঢ় করতো। বড়দের মানা, প্রত্যেক সম্পর্ককে সম্মান করা এসব কিছুই তারা শিখতো গুরুজনদের কাছ থেকে। সেই পারিবারিক সম্পর্ক এখন অনেক আলগা হয়ে গেছে। এখন চারপাশে জীবন ও জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত সবাই। ফলে অসুখী দাম্পত্য, সন্তানের লেখাপড়া, ক্যারিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, চাওয়া-পাওয়া আর উন্নতির চক্রে ঘুরছে সবকিছু। এমনকি মেকী বন্ধুতাও এখন চাকরি বা প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে।

এটা ঠিক, প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন আনছে। কিন্তু পারিবারিক অনুশাসন না থাকায় সেই প্রযুক্তি আর আকাশ সংস্কৃতির স্রোত আমাদের ভালো মন্দ চেনাচ্ছে না। পারিবারিক অনুশাসনের বাইরে চলে আসায় অভদ্রতা করা, মানুষকে অসম্মান করাটাকে স্মার্টনেস জ্ঞান করা হচ্ছে। এসব শিক্ষা স্কুল-কলেজের বাইরে পরিবার থেকেই পায় সবাই। সেই পরিবার কাঠামোই তো নেই। দাদ-দাদী, ফুপু, চাচা-চাচীর বদলে ছোট পরিবারে শিশুর সার্বক্ষনিক সহচর কাজের মানুষটি।

পাশাপাশি আধুনিক একক পরিবারের পিতামাতার জন্য একটি দুঃসময় পোহাতে হয় জীবনের পড়ন্ত বেলায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত, বড় কর্মকর্তা করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে সারাজীবন। কিন্তু উপেক্ষিত থাকে সুশাসন, মূল্যবোধ, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মতো বিষয়গুলো। ফলশ্রুতিতে, জীবনের শেষবেলাতে তাদের আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রমে বা ঐ জাতীয় কোন সেফ হোমে। আপনি যদি এমন গুরুজনদের জিজ্ঞেস করেন, তাহলে হয়তো একটি উত্তর আসবে যে, তাদের ছেলে বড় অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রশাসনের বড় কর্মকর্তা। গরীব কোন সন্তানের মা বাবা বৃদ্ধাশ্রমে আছে এমনটি খুঁজে পাওয়া দুস্কর। আর যৌথ পরিবারের কোন মা বাবার ক্ষেত্রে এটি নেই বললেই চলে। কেননা, কোনো না কোনো সন্তান তাদের দায়িত্ব নেবেই।

সৃষ্ট সমস্যাসমূহ– যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে রূপান্তরিত হবার ফলে অনিবার্যরূপেই কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন- সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের সমাজে বিচ্ছিন্নতার হার বাড়ছে। গত দুই দশকে নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর পিছনে কারণ হিসাবে তারা নগরায়ন ও শিল্পায়নকে দায়ী করেছেন।

পরিবার অপরাধ ও হিংস্রতা কমানোর শক্তিশালী মাধ্যমরূপে সামাজিকীকরণে বাস্তব ভূমিকা রাখে। এই শৃংখলার মধ্যে ছেলেমেয়েরা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক নিয়মগুলো শেখে। বংশানুক্রমিকভাবে দাদা, দাদি, বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি, নাত-বউ এবং নাতনি নিয়েই আমাদের যৌথ পরিবারগুলো পরিচালিত হত। এরসঙ্গে জ্ঞাতি সদস্যদের মধ্যে ছিল চাচা ও চাচি, চাচার ছেলে ও মেয়ে, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইয়ের ছেলেমেয়ে এবং এই ধারাবাহিকভাবে অন্যান্যরা। কিন্তু হাল ‘আমলে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী আর সন্তান। অন্যরা হচ্ছে আত্মীয়।

---

[৯৫] প্রাগুক্ত- পৃ. ৫১।

সূচীপত্র

ফলে, স্বভাবতই এই সমস্ত মূল্যবোধ থেকে একক পরিবারের সন্তানরা বঞ্চিত হয়। নীতি, আদর্শ, অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ, সহনশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এগুলো তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম হয়। পাশাপাশি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক আদবকেতা এগুলোর চর্চাও তাদের মধ্যে কম হয়। এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা তামান্না ফেরদৌসি বললেন, আমি যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি। অনেক কিছুই স্বাধীনভাবে করতে পারতাম না। দাদা, বড় চাচারা খুব গোঁড়া ছিলেন। মফস্বলের কলেজেরে বাইরে পড়তেই দিলেন না। তাই আমার ইচ্ছা ছিল ছোট্ট পরিবার হবে। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী সংসার হবে। কিন্তু এখন আমার দুই মেয়ে যখন বড় হচ্ছে তখন বুঝি গুরুজন থাকা কতটা জরুরি। গুরুজনদের কাছে থাকলে বাচ্চার বড় হওয়া ভদ্রতা, আচার আচরণ শেখে। সারাদিন অফিস করে আমরা স্বামী-স্ত্রী তো খুব একটা সময় দিতে পারি না।

এছাড়াও বাংলাদেশের সমাজে বিচ্ছিন্নতার হার যে অনুপাতে বাড়ছে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে সমাজ বা রাষ্ট্রের এখনো যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে তারা মনে করছেন। সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলছেন, “বাংলাদেশে গত দুই দশকে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলে অনেক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন। এদিকে গ্রামগুলোতে যে পরিবার ব্যবস্থা ছিল, তার ধারণাও পাল্টে গেছে। এখন গ্রামের মেয়েরাও শহরে আসছেন কারখানায় কাজ করার জন্য। আবার যারা বিবাহিত নারী, তারা কাজে আসার সময় সন্তানকে নিজের বাবা-মায়ের কাছে রেখে আসছেন।” কেননা, বাংলাদেশে গত দু’ দশকে নগরায়ন হয়েছে ব্যাপকভাবে– সাথে সাথে বহু নারী শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কাজ করতে শুরু করেছেন। এরফলে, শহরেও এখন যৌথ পরিবারের তুলনায় একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া ও নগরায়নের কারণে মানুষের মূল্যবোধেরও অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। বাড়ছে গ্রামের সাথে বিচ্ছিন্নতার হার উদ্বেগজনকভাবে। শহরে এসে টিকে থাকার সংগ্রামে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরী করছেন, তাদের ব্যস্ততা বেড়েছে, স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক ধ্যানধারণার আদি স্তর থেকে তারা সরে এসেছেন।

যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠনের ফলে, তালাকের হার বেড়েছে অনেক গুণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহযোগী অধ্যাপক বলছেন, একটি জরিপ মতে, গত এক দশকে তালাকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলেও তালাক দেয়ার হার শহরের চেয়ে বেশি।

আর এই তালাক দেয়ার তালিকায় বেশিরভাগই নারী। সুতরাং নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে বড় একটি পরিবর্তন আসছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ‘ইগো’ বা আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকারবোধ এর উপস্থিতি এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই চাকরীজীবী বা কর্মজীবী স্ত্রী স্বামীর সব নির্দেশকে মেনে নিতে পারে না। ফলে, মতানৈক্যতার কারণে পারিবারিক কাঠামোনতেও ধ্বস নেমে এসেছে। এখন শুধু স্বামী-স্ত্রীর একক পরিবারই নয়, কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা থাকতেও দেখা যাচ্ছে। বাড়ছে দূরত্ব, সৃষ্টি হচ্ছে পরকিয়ার, বাড়ছে বিচ্ছিন্নতার হার।

উপসংহার : পারিবারিক অবস্থান একক না যৌথ, বড় না ছোট এটি মূখ্য বিষয় না। মূল বিষয়টি হলো পরিবারের সদস্য হিসাবে আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছি, তার উপর। কেননা, জীবনের কঠিন বাস্তবতায় কর্মের তাগাদাকে আমরা যেমন অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি পারি না আমাদের শিকড়কে ভুলে যেতে। শিকড়ের যত্ন নেওয়াটাই হলো মূখ্য বিষয়। আর পরিবারের কর্তা হিসাবে দাদা, পিতা বা গুরুজনদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তাদের সঠিক সৎ সিদ্ধান্তগুলোকেই নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পরিবারের সদস্য হিসাবে অন্যদের ভূমিকাকেও মেনে নিতে হবে অবনত চিত্তে। শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটাও হতে হবে শক্তপোক্ত। কর্মের তাগিদে আলাদা অবস্থান করা মানেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রোজগেরে হিসাবে আমি যেনো একজন সদস্য আর মতামত দাতাই থাকি। নিদের্শনার ক্ষমতাটা যেনো বহাল থাকে বয়োজৈষ্ঠ্যদের হাতেই। এই নিশ্চয়তার ভারটুকুও আমাদের উপর। আমি যেনো ভুলে না যাই, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি আমার কর্তব্যের সেই অমোঘ নির্দেশনাকে।

“রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগীরা।”

হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা ছোটবেলায় আমার প্রতি যেমন আচরণ করেছেন, আপনিও তাদের প্রতি তেমনি রহম করুন।

তাহলেই কেবল পরিবারের কর্মকাণ্ড হবে সুখময়, প্রাণবন্ত, আর সু-সম্পর্কের এক সূতিকাগার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন পরিবারের সদস্য হবার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক চিহ্ন ওয়্যার সিমেট্রি

–মো. কায়ছার আলী[*]

Known upto God ‘ঈশ্বরের কাছে পরিচিত’। এই বাক্যটি লিখা আছে চট্টগ্রামের দামপাড়া এলাকার ১৯ নং বাদশাহ মিয়া রোডের পাশে ওয়্যার সিমেট্রির একটি এফিটাফে। বিশ্ববিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং এই ইম্পেরিয়াল ওয়্যার গ্রেভস কমিশনের কর্মরত থাকাকালীন এই বাক্যটি এফিটাফের জন্য নির্বাচন করেন। যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের নিহত অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের এফিটাফে লিখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নাম জানা না জানা তরুণ যুবকেরা অ্যাডভেঞ্চারের আশায় বিশ্বজয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁরাই আজ শায়িত আছেন অজ্ঞাতনামা নামে। যুদ্ধ শেষে ঘরে ফেরার ছিল যাঁদের তাড়া, এখানে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা। অনেক সৈনিকের না বলা কথা প্রিয়জনদের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন বা পাঠাতে পারেননি অথবা মৃত্যুর পর তাদের প্রিয়জনের কাছে লিখা চিঠিগুলো পৌঁছেছিল কিন্তু ততক্ষণে তাঁরা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। কারো মৃত্যুর পর চিঠিগুলো বিদেশ থেকে এখানে এসেছিল। আবার কারো কারো বুকের তাজারক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই চিঠিগুলো।

যুদ্ধের পরিণাম সবসময় ভয়াবহ। যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয় অগণিত জনপদ, শহর নগর বন্দর গ্রাম আর অসংখ্য মানুষ। প্রাচীন মহাকাব্যগুলো যুদ্ধের মহাকাব্য বা বীরত্বে গাঁথা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সভ্যতার অংকুরোদগম হয়েছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আধুনিক সমাজের সুমহান আদর্শ, স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব-মৈত্রী, সমাজ পরিবর্তন ধারার মূলে রয়েছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কোথাও কোথাও আবার শান্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। ষষ্টদশ-সপ্তদশ শতকের ধর্ম যুদ্ধ বা উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের যুদ্ধের তুলনায় বিংশ শতকের যুদ্ধ অতি নৃশংস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুড়ি বছর পরেই আবার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) জার্মান-জাপান-ইতালির অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ এ যুদ্ধে শক্তিশালী মানুষের গলায় জয়মালা পরিয়েছিল কিন্তু ১৯৪৫ সালের সেই কলংকিত দিন ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, অগণিত মানুষের বীভৎস কবর রচনা করে। তারপর শুরু হয় পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলে দেখা যায় মিত্রশক্তির বিজয়, জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্যের পতন, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান। ১৯৩৭ সালে জাপান চীনে এবং ১৯৪১ সালে আমেরিকার পার্ল হারাবারে আক্রমণ করে। এরপরে জাপানিরা মালয়-সিংগাপুর দখল করে। বার্মার দিকে এগোতে থাকে। বার্মা-ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন রেংগুনের পতনের পরপরই ব্রিটিশ ঘাঁটি গড়েন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে সমুদ্র বন্দর এবং আন্দরকিল্লায় হাসপাতাল থাকায় তারা সেখানে ঘাঁটি নির্মাণ করে। ১৯৩৮ সালে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধের।

জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাডলফ হিটলার গায়ের জোরে নয়, কথার জাদুতেই জার্মানদের ভোলান। হিটলার ও নাৎসী বাহিনী ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল জার্মানি তার সম্পদ, সম্মান এবং ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই হারিয়ে আর বসে থাকতে পারে না। ২য় বিশ্বযুদ্ধের বা মহাসমরের মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি ৩০টি দেশের সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে। এই নৃশংসতম যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা হলোকাস্ট, পারমাণবিক বোমার ব্যবহার কুখ্যাত এই যুদ্ধে পাঁচ থেকে সাড়ে আটকোটি মানুষ প্রাণ হারায়। নানা ধর্মের নানা জাতের মানুষ একাট্টা হয়ে লড়াই করেছিল জার্মানির নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের সেনাদের স্মৃতিকে চিরঅম্লান করে রাখার জন্য সারা পৃথিবীতে ২৩ হাজার ওয়্যার সিমেট্রি তৈরি করেন ১৭ মিলিয়ন সৈন্যের জন্য। ভারতীয় উপমহাদেশে মিত্র বাহিনীর ৪৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তাদের ৯টি সমাধিক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশ, বার্মা ও আসামে। বাংলাদেশে দু'টো কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে। ওয়্যার সিমেট্রিগুলো রক্ষণাবেক্ষণসহ সব পরিচালনা করেন কমনওয়েলথ ওয়্যার গ্রেভ কমিশন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এ উপমহাদেশে সেনা, নৌ, বিমান সেনাদের আত্মত্যাগ বা আত্মদান বৃথা যায়নি।

---

[*] *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীরদের কারণে ১৯৪৫ সালে হিটলার ও বার্লিনের পরাজয় ও পতন ঘটে। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ১১ তারিখ সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে বার্ষিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেওয়া ওয়্যার সিমেট্রিতে রয়েছে নান্দনিক রূপ। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অপরূপ এক সমাধিস্থল, এলাকা দু'টো দেখতে অনেকটা নীলাভ মনে হয়। এজন্য এ স্থানগুলোকে নীলপাহাড়ের দেশ বলেও অভিহিত করা হয়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার ওয়্যার সিমেট্রি তৈরি করা হয় ১৯৪২-১৯৪৪ সালে। তৎকালীন ময়নামতি ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম, যেটা পরবর্তীতে ব্রিটিশ সামরিক বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেনাঘাঁটির সঙ্গে ছিল হাসপাতাল। বিশেষ করে কুমিল্লা ছিল যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্র। বিমানঘাঁটি ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ১৪তম সদর দফতর। সিমেট্রি দু'টো অত্যন্ত ছায়া সুনিবিড়, নীরব, নিস্তব্ধ, নির্জন, দৃষ্টিনন্দন এবং শৈল্পিকতার ছাপে ভরা। স্বশরীরে দেখলে আপনার কাছে মনে হবে এরকম শান্তিময় পরিবেশ আর হয় না। এখানে দৌড়াদৌড়ি করা, কাপড় পাল্টানো, গাছে উঠা, এফিটাফের রং নষ্ট করা বা অযথা আড্ডা মারা নিষেধ। এ অসৌজন্যমূলক কাজগুলো করা মানে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিদের ডিস্টার্ব বা বিরক্ত করার মতো। ১৩টি দেশের চট্টগ্রামে ৭৫৫ জন, কুমিল্লায় ৭৩৭ জন সারিবদ্ধভাবে শুয়ে আছেন। সমাধির প্রতিটি ফলকে নাম, মৃত্যুর তারিখ, পরিচয়, পদ পদবির পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতীকও আছে। দু'টো সমাধির মাঝে হরেক রকমের ফুলগাছ সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। উঁচু বেদী বা বেদীতে ক্রুশ প্রতীক থাকায় স্থানীয় লোকেরা এটাকে খ্রিষ্টানদের কবর স্থান বলে থাকেন। প্রত্যেক সৈনিককে এখানে নিজ নিজ ধর্মীয় মর্যাদার সাথে সমাহিত করা হয়। সমাধিগুলো দেখলে আপনার চিন্তাশক্তিকে শানিত করে মানবিকতা জাগ্রত করবে। প্রতিটি সৈনিকের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দ বেদনার কথা গভীরভাবে স্মরণ করে দেয়, যেকোনো যুদ্ধ বা লড়াই পরিত্যাগ করতে হবে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর মধ্যে যদি হিংস্রতা দূরীভূত না হয় তাহলে শান্তি চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরে সোনার হরিণ হয়েই থাকবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারমাণবিক মরণ যুদ্ধের আয়োজনে শান্তিকামী মানুষেরা ত্রস্ত ও শংকিত। আধুনিক মারণাস্ত্রের ধূমায়িত সমস্যার মধ্যেই শান্তির দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত। ☒

শীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা : কারণ ও প্রতিকার

শীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা, যা বয়স, জীবনধারা বা শারীরিক আঘাতের কারণে হয়ে থাকে। এটি কাঁধ, কনুই, কোমর, পিঠ, হাঁটু এবং অন্যান্য অঙ্গে হতে পারে। ব্যথা কখনো হালকা ঝাঁকুনি বা অস্বস্তি হিসেবে অনুভূত হয়, আবার কখনো তীব্র আঘাতের মতো হয়ে থাকে। সঠিক কারণ নির্ণয় এবং যথাযথ প্রতিকার গ্রহণ না করলে এটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

কাঁধের ব্যথা সাধারণত আঘাত, পেশীর টান বা রোটেটর কাফের সমস্যার কারণে হয়। এছাড়া বয়সজনিত অস্থিসন্ধি প্রদাহ বা আর্থ্রাইটিসও কাঁধের ব্যথার একটি প্রধান কারণ। কাঁধ ব্যথার ক্ষেত্রে হালকা ব্যায়াম, ফিজিওথেরাপি এবং গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক উপকারী। যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে ঔষধ বা প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার করা হয়।

কনুই ও হাতের ব্যথা প্রায়ই 'টেনিস এলবো' বা 'গলফার এলবো'-এর কারণে হয়। এটি মাংসপেশির অতিরিক্ত চাপ বা পুনরাবৃত্তি কাজে হঠাৎ আঘাতের ফল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থ্রাইটিসও কনুই ব্যথার একটি সাধারণ কারণ। প্রতিকার হিসেবে হালকা স্ট্রেচিং, পেইন রিলিভার ক্রিম বা ঔষধ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম অত্যন্ত কার্যকর।

কোমর ও পিঠের ব্যথা সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা। এটি সাধারণত মাংসপেশির টান, হাড়ের ডিস্কের সমস্যা বা আর্থ্রাইটিসের কারণে হয়। দীর্ঘ সময় একভাবে বসা, ভারী জিনিস তোলা বা অস্বাস্থ্যকর ভঙ্গিমা কোমর ব্যথাকে তীব্র করে। কোমর ও পিঠের ব্যথা কমাতে হালকা ব্যায়াম, ফিজিওথেরাপি এবং প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার করা হয়। গুরুতর ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

হাঁটু এবং পায়ের ব্যথা সাধারণত আর্থ্রাইটিস, গাউট, মাংসপেশির দুর্বলতা বা আঘাতের কারণে হয়। অতিরিক্ত ওজন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা বা ভারী কাজও হাঁটু ব্যথা বাড়াতে পারে। হাঁটাচলায় ওজন নিয়ন্ত্রণ, হাঁটুর সাপোর্ট ব্যবহার, ব্যথানাশক ঔষধ এবং শারীরিক থেরাপি হাঁটু ও পায়ের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

সাধারণভাবে শীরের ব্যথা প্রতিরোধ ও উপশমের জন্য হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, যথাযথ বিশ্রাম এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ ও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে সমস্যার তীব্রতা কমানো সম্ভব। ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্র হলে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক বা রিউমাটোলজিস্টের পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। সঠিক যত্ন, নিয়মিত ব্যায়াম এবং চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে শীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রতিটি অঙ্গের ব্যথা নির্দিষ্ট কারণে হয় এবং তার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিকার রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকা, ব্যথা দেখা মাত্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

নিভৃত ভাবনা

আকসার ঐ আবাবিল

–সুপ্ত রায়হান সজিব*

অবরুদ্ধ গাজায় এবার শীতটা একটু বেশিই পড়েছে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু কমই বটে।

এই তীব্র শীতের সকালে আল সার্ম পার্কের অ্যালুমিনিয়ামের বেঞ্চিতে বসে আনমনে নিজের কৃত্রিম পায়ের ওপর হাত বোলাচ্ছে ফাইজা।

অনবদমিত অশ্রুগুলো অন্য হাতে থাকা কুড়িয়ে পাওয়া বাকলাভার উপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। তাঁর মনে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ নামক প্রহেলিকা তো কবেই মন থেকে পালিয়ে গেছে। আছে শুধু ক্ষোভ।

ক্ষোভটা ঠিক কেমন, সেটাও সে জানে না।

ঠিক ক্ষোভ নয়, আক্ষেপ। কিছু করতে না পারার আক্ষেপ। কৃত্রিম কাঠের পা নিয়ে সে কীইবা আর করতে পারবে!

ফাইজার বয়স বেশি নয়। সবে মাত্র ১৬। কিন্তু এই ১৬ বছর বয়সেই তাঁর ১৬ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। ছোট্ট এই জীবনে মৃত্যু নামক চিরন্তন সত্যকে সে খুব কাছে থেকে দেখতে পেয়েছে। এক বার নয়, বারবার।

“মৃত্যু” তাঁর মনে কালিকাময় এক শোকপূর্ণ উপাখ্যান রচনা করেছে। সবাইকে হারিয়ে সে যেন ইমারতের ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়ানো এক ভগ্ন মিনার। জায়নাবাদীদের কনসেনট্রেশান ক্যাম্প থেকে এইতো কয়েকদিন হলো মুক্তি লাভ করেছে।

দুইদিন অভুক্ত থাকার পর আজ এই পার্কের ডাস্টবিন থেকে অর্ধগলিত এক টুকরো বাকলাভা কুড়িয়ে পেলো। সেটাই এখন আহারের একমাত্র উপজীব্য।

আজ পরিবারের সকলের কথা খুব মনে পড়ছে। বিশেষ করে দাদুর কথা, যদিও সে কোনোদিন তাকে দেখেনি। যিনি ১৯৭৩ সালের চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে সিরিয়ার হয়ে একজন ফিলিস্তিনি সেনা কমান্ডো হিসেবে কাজ করতেন। তিনি প্রখর মেধাসম্পন্ন ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। দিনভর যেমন গোলাবারুদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ঠিক তেমনই সারারাত নিজেকে খোদার ‘ইবাদতে মগ্ন রাখতেন। রমাযান মাসেও সারাদিন রোযা রেখে ব্যারেল টু ব্যারেল বারুদ ফুরিয়েছেন। যুদ্ধজয়ের আশা নিয়েই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু, বিধাতার নির্দেশে এই যুদ্ধের অপমানজনক ইতির পূর্বেই সিনাই উপত্যকায় বুকের পাজরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জীবনের শেষ সায়াহ্নে সহযোদ্ধারা মশক ভরা পানি নিয়ে দাদুর মুখে ধরে। কিন্তু তিনি পানি খেতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি সাওমে রত।

পৃথিবীর এই তুচ্ছ পানি পান করে জান্নাতের বাকীর ঝরণাধারার পানি হতে বঞ্চিত হতে চাননি। দাদুর মৃত্যু হলো, কিন্তু যুদ্ধে জয় সম্ভব হলো না। পরিশোধ হলো না দাদুর রক্তের ঋণ। মিসর সিনাই উপত্যকা ফিরিয়ে পাওয়ার বদৌলতে ইসরাঈলকে দেয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। যেটা ছিল ইসরাঈলকে দেওয়া কোনো মুসলিম বিশ্বের দিক হতে প্রথম ন্যক্কারজনক কোনো পদক্ষেপ।

ঘৃণ্য ক্যাম্প-ডেভিড চুক্তিতে শুধুমাত্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্বাক্ষর করলেন আনোয়ার সাদাত। শহীদদের লাশের উপর পা রেখে মিথ্যা মানবতা বাঁচানোর হাসি হেসেছিলেন তৎকালীন সাদাত সরকার।

ফাইজারা বংশানুক্রমিকভাবে ফিলিস্তিনি ও গাজার অধিবাসী। ওদের প্রপিতামহের পিতামহ ওদের বংশের গোড়াপত্তনকারী। সে জন্ম নিয়েছে সোনার চামচ মুখে নিয়ে নয়, বারুদের ব্যারেল হাতে নিয়ে। সৃষ্টিকর্তা যুদ্ধকে ওদের ভাগ্যের সঙ্গে সীলমোহরের ন্যায় এঁটে দিয়েছেন।

একপক্ষীয় যুদ্ধে এরিয়েল শ্যারনের তৈরিকৃত হায়েনা পালের বীভৎস আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত মেষপালের মতো দিগবিদিক ছুটে চলছে তাঁরা। শোণিতের উল্টো ধারায় আটকে গেছে তাঁদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও, মূল সমস্যাটা শুরু হয় ২০০৩ সালে।

কারণ ওই বছরেই ওর বাবা হামাসে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যোগ দেন। এর ফলে ফিলিস্তিনিদের তৎকালীন বৃহৎ সংগঠন ফাতাহ-এর রোষানলে পতিত হন।

২০০৬ সালের নির্বাচনে হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও, এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ঘোষণা দেয় ইসরাঈল তথা আমেরিকার দালালগুলো। অপরদিকে অহিংসতায় বিশ্বাসী ফাতাহর সামনে মূলা ঝুলিয়ে তো রেখেছেই। তখন, ফাইজার বাবার মতো লক্ষ লক্ষ হামাস যোদ্ধারা রাজপথ ও বিরান মরুভূমির বুকে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান।

এরপর কি আর হবে?

সকল স্বৈরাচারী শাসকদের ন্যায় আইজাক রবিনও দমন ও পীড়ন নীতি চালু করেন।

বুলেটের দাপটে ব্যালটের অধিকারও রাজপথে বিলীন হয়ে গেলো। তাই বলে কি আর হামাস বসে থাকবে? শুরু হলো প্রচণ্ড প্রতিরোধ।

গেরিলা আক্রমণে ইস্রাঈল নাকানি-চুবানি খেলেও, বারুদের বারতায় পিছু হটতে বাধ্য হলো হামাস। শুরু হলো গাজা উপত্যকায় প্রবল ধরপাকড়। অন্যান্য হামাস নেতার ন্যায় ফাইজার আব্বাকেও ধরে নিয়ে গেল ওরা।

তিনমাস কারাগার নামক অঘোষিত নরকে অমানবিক নির্যাতনের পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এদিকে ফাতাহ তথা পি. এল ও প্রধান ইয়াসির আরাফাত ইসরাঈলের সাথে সমঝোতা চুক্তি করে নোবেল অর্জন করে বিশ্বে শান্তি পয়দা করে বিষ প্রয়োগে অক্কা পেয়েছেন।

ইয়াসির অক্কা পাওয়ার পর জায়ানিস্টদের প্রতাপ আরো বেড়ে যায়। এর মাঝেই ফাইজার জন্ম হয়। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে মেয়েটি। গাজার পরিস্থিতিও দিন দিন ঘোলাটে মেঘে ঢাকা পড়ে। জায়নাবাদী ফোর্সদের অত্যাচারের মাত্রাও তখন সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। গুপ্তহত্যা ক্রমাগত প্রকাশ্য হত্যায় রূপ নিচ্ছে।

মিথ্যা ইস্যু তৈরি করে বুনো পাখিদের মতো নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের। মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে হোলি খেলায় মেতেছে ওরা। না, আর না। এভাবে মুখে তালা লাগিয়ে বসে থাকা যায় না।

এবার ভাঙতে হবে লোহার শিকল,
শোনাতে হবে মুক্তির গান।

হামাসের প্রতিবাদের সুরে সুর মেলালেন ফাইজার বাবাও। হাতিয়ার ছাড়া কি আর হায়েনাদের হটানো যায়? কিন্তু, উন্নতমানের হাতিয়ার ওরা পাবে কোথায়?

তাই, যতোই পরিকল্পনা করা হোক না কেন, উল্লুকদের সমরাস্ত্রের মুখে বার বার হেরে যায় ওরা। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলেন গেরিলা যুদ্ধের। এতে আধো আধো সূর্যাভের সন্ধান পাওয়া গেল। এভাবেই চলতে থাকে। হঠাৎ, এক রাতে ঘটে গেল এক ট্রাজেডি।

ইসরাঈলি বর্বরতা জানতে পারলো আব্বুর কথা। ওরা হানা দিলো বাড়িতে। ধরে নিয়ে গেল বাবাকে। হত্যা করা হলো ওর ছোট চাচা, মা ও দাদীকে। বাবার সামনেই ধর্ষণ করা হলো ফাইজাকে। অবলা বোবা মেয়েটা নীরবে সহ্য করলো সেই অপমান। শুধু ধর্ষণ করেই ওরা ক্ষান্ত হলো না, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। সেখানে দীর্ঘ ২ বছর যাবৎ অবর্ণনীয় নির্যাতন ও বিকৃত যৌনাচারের শিকার হয়ে মাত্র কয়েকদিন হলো ছাড়া পেয়েছে। পাথর দিয়ে পা ভাঙার পর ওর সেখানে কোনো মূল্য নেই।

তাঁর কি পৃথিবীর বুকে আদৌ কি কোনো মূল্য নেই? সে কি এতোটাই মূল্যহীন? বোবা ও খোঁড়া হওয়ার কারণে সে কি মুসলিম জাতির জন্য কিছুই করতে পারবে না? পারবে না বর্বর ইহুদিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢাল হতে? এতোই অচল সে?

তাই কি? নিজেকে অনবরত প্রশ্ন করে ফাইজা।

কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। শুধু প্রশ্নগুলোই মনের ব্যালকনিতে বারবার ঘুরপাক খায়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় অক্টোবর মাসের কথা। এই তো গেল যে অক্টোবর মাসটা। ঠিক মাসের কথা নয়। সেই মাসের প্যারাগ্লাইডিং ফাইটারদের কথা।

যারা সামান্য কিছু অস্ত্র পুঁজি করে, প্যারাসুট নিয়ে, কিটবুজ মরুভূমির জেনিন সীমান্ত পার হয়ে, জায়োনিস্টদের সুপারনোভা মিউজিক ফ্যাস্টিভাল নামক নগ্ন উৎসবে হামলা চালায়। এতো গেলো ৭ অক্টোবরের কথা, বেশিদিন তো গত হয়নি। ওরা পারলে আমি কিছু করতে পারবো না কেন? এই কথাটি বারবার ওর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।

বোবার মুখে প্রতিবাদের বুলি ফুটেছে। সেও কিছু করতে চায়। নিজেকে আর কষ্টের কনডেমড সেলের মাঝে বন্দী রাখতে চায় না। দেয়ালে যে পিঠ ঠেকে গেছে, প্রতিবাদ তাই করতেই হবে।

না, আর তিল পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না।

সময় এসেছে বদলা নেওয়ার। খুনকা বদলা খুন। রক্তের বদলা রক্ত। সমগ্র ফিলিস্তিন ওদের ছিল ওদেরই থাকবে। জানোয়ারদের হিংস্র থাবায় অনেকবার রক্তাক্ত হয়েছে ওরা, এবার সময় এসেছে বেয়নেট দিয়ে সেই থাবা থেঁতলে দেওয়ার।

হাতে রাখা অবশিষ্ট বাকলাভা মুখে পুরে উঠে দাঁড়ালো সে। তাঁর সংকল্প এখন একটাই– তিলে তিলে, নীরবে নিভৃতে মৃত্যুর চাইতে, শহীদ হওয়াই উত্তম। মরতে তো একদিন হবেই।

২০ দিন পর... কিলুত মরুভূমির কোনো এক জায়গায় অবস্থান করছে হামাসের ইন্টেলিজেন্স ও সাঁজোয়া ফোর্সের কয়েকজন সদস্য। একটু দূরে একটা ওয়াদি পেরোলেই আজিবা সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া। ওর অল্প একটু দূরেই মুসলমানদের পবিত্রভূমি জেরুজালেম।

সূচীপত্র

সেখানেই বিদ্যমান মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদ আল আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস। যেখান থেকে মানবতার অগ্রদূত ও নবীকূলের শিরোমণি মোহাম্মদ (ﷺ) বোরাক নামক প্রাণীতে আরোহণ করে উর্ধ্বাকাশে তথা মি'রাজে গমন করেছিলেন। সেই স্থান আজ নব্য ক্রুসেডার ও দাজ্জালের জায়নাবাদী দালালদের দখলে।

খ্রিষ্টান ও ইহুদি জাতি দু'টোই আজ এক হয়ে এই বিশ্বের বুকে অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমানদের বিপক্ষে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তাই তো এই মসজিদের পাশে গড়ে তুলেছে ওয়ালিং ওয়াল এবং টাওয়ার অব ডেভিডসহ আরো কতো কি। চলছে আল আকসা ভেঙে থার্ড টেম্পল গড়ার কুচক্রী পরিকল্পনা।

জাতিসংঘ নামক সংগঠনটি ব্যার্থ মনোরথে নীরব দর্শক হয়ে সবকিছু তাকিয়ে দেখছে।

কিছুই করার নেই। কারণ বিশ্বকে ওরা নিজেদের কব্জায় টেনে নিয়েছে।

এখন শুধু ঈমাম মাহদী ও 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য অপেক্ষার প্রহর গোনা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। কারণ আমাদের কোনো নেতা নেই। নেতাহীন এই মুসলিম বিশ্ব মার খেতে খেতে যেনো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

শুধু কি ফিলিস্তিন!

চীন, মিয়ানমার, বসনিয়া, চেচনিয়া, ককেশাস, সোমালিয়া, বুরকিনা ফাসো, আজারবাইজান, লেবানন, সিরিয়া, পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমার –এসব দেশে মুসলমানদের হাহাকার ও আর্তনাদ বিশ্বের বুকে মানবতাকে অবিরাম ধর্ষণ করে চলছে নিয়মিত।

তবুও কি বসে থাকা যায়? নির্যাতন সহ্য করতে করতে দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে, পায়ের নিচ হতে মাটি সরে, ঠিক তখনই মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কারণ তিলে তিলে মৃত্যুর চাইতে অত্যাচারীর মসনদে সিংহের থাবা বসিয়ে, ঘায়েল করে একটা চিহ্ন এঁকে মৃত্যুবরণ করা অধিক তৃপ্তিময়।

তাই তো মাজলুমানেরা যুগে যুগে জালিমের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহের বারতা শুনিয়ে শান্তির ধ্বজা উত্তোলন করে আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

তাই আজ এই আয়োজন। এই দলের উদ্দেশ্য হলো– আজ তাঁরা আকসা জয় করবেই।

অদম্য সে সংকল্প। তাই আজকের অভিযানের নাম দিয়েছে– "অপারেশন আল আকসা ফ্লাড"।

শুরু হলো কার্যক্রম। একে একে প্যারাসুট পিঠে বেঁধে সীমান্ত অতিক্রম করলো কয়েকজন। হঠাৎ অবাক করে দিয়ে সেখানে হাজির আমাদের ফাইজা। কিন্তু সে সাধারণ কোনো বেশে নয়, একজন প্যারাগ্লাইডিং যোদ্ধার পোশাক পরিধান করে বান্দী হাজির। হুইল চেয়ারের সাথে উড়ন্ত প্যারাসুট, হাতে উদ্যত কালাকশিনভ।

আবাবিল। হ্যাঁ, আবাবিল। একুশ শতকের আবাবিল। যে আবাবিলের মুখে পাথর নেই, বুকে শুধু পাথরচাপা কষ্ট। কষ্ট, হরেক রকম কষ্ট।

স্বজন হারানোর কষ্ট, নীরবে নির্যাতিত হওয়ার কষ্ট, মৌলিক অধিকার খর্ব হয়ে যাওয়ার কষ্ট, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার কষ্ট।

আবরাহা নেই, আছে শুধু তাঁর উত্তরসূরীরা। তাই, নব্য আবরাহাদের বিরুদ্ধে ফাইজাদের এই অভিযান। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে আকাশে ওড়ে গেলো। আজ তাঁর স্বপ্ন পূরণের দিন। ছোট্ট বেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল কুব্বাতুস সাখরার ঐ গম্বুজ দু' হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে। সোনালী রঙের গম্বুজটা কতোই না মনোহর!

আজ সেটা সত্যি হবে কি? বাতাসের গতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে উড়ে যাচ্ছে ফাইজার হুইল চেয়ার। অল্প সময় পর সেও জেরুজালেমে প্রবেশ করলো। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে আকসার ঐ সোনালী গম্বুজ।

নিচ থেকে জায়োনিস্ট জানোয়ারদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। গুলিও করছে অনবরত। না। আর চুপ থাকা যায় না। গর্জে উঠলো ফাইজার কালাকশিনভ। নিমিষেই কয়েক ডজন শত্রু খতম। নিজের হাতকে বিশ্বাস করতে পারছে না ফাইজা। অগ্রে আসা সহযোদ্ধারা বারুদের তুফান সৃষ্টি করে চলেছে।

মুহূর্তের একটি খণ্ডযুদ্ধে বিজয় হলো আল আকসা। সবার চোখে আনন্দ অশ্রু। কিন্তু ফাইজা কোথায়? সবাই ফাইজাকে খুঁজছে। কিন্তু কোথায় সে?

হঠাৎ পিছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠলো : কুব্বাতুস সাখরার দিকে তাকাও?

নিমিষেই সবার দৃষ্টি সেদিকে আবদ্ধ হলো। গম্বুজকে জড়িয়ে ধরে একটি নিথর দেহ দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তিটি অস্পষ্ট। সহযোদ্ধারা কাছে যেতেই দেহটি নিস্তেজ হয়ে ভূমিতে ঢলে পড়লো। এ যে আমাদের ফাইজা। সকলে সমস্বরে বলে ওঠলো : 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'।

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

শাহাদাত? হ্যাঁ, শাহাদাত! শাহাদাত বরণ করেছে আমাদের ফাইজা। শাহাদাত বরণ করেছে পৃথিবীর এই আবাবিল। একুশ শতকের ডানাবিহীন এক আবাবিল। ☒

সূচীপত্র

কবিতা

হৃদয়ের ঘা

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

কত ঘা! ছোট্ট এই মানব দেহে
কাটা ঘা ফাটা ঘা ফোড়া ঘা বিষ ফোড়া ঘা-
ঘায়ের ভীষণ যন্ত্রণা!
পঁচে গলে মাংস অস্থি গিলে খায়
কী বিশ্রী গন্ধ!
প্রিয়জনও দূরে ঠেলে চলে যায়
নিঃস্ব অসহায় নিথর দেহ
সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে ক্ষুধা মেটায়,
তারপর দম আটকে গিয়ে আঁখি বুজে
ঘুমোয় চিরতর
কখনো শুকোয়, এমনভাবে শুকোয়!
চিহ্নের লেশটুকুও থাকে না।
তবে, কিছু কিছু ঘা আছে ভিন্ন
পঁচাসরা গন্ধ নেই, চিকিৎসকের হাত নেই
একেবারে মারেওনা বাঁচায়ও না,
কেবল দিতে থাকে থরেথরে নরকবেদনা।
কত না পাওয়ার শোক, হারানোর ব্যথা-
ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে হৃদয়ের ঘা।

সৃষ্টি করেছ তুমি

মজিব আল-মাওড়ী★

তোমার আকাশ!
কী সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ তুমি।
তোমার বাতাস!
দাপিয়ে বেড়ায়, স্পর্শ করে ভূমি।

তুমি চমৎকার, তুমি গণৎকার
গগণভিসারী জ্যোতিষ্কমালা,
আলো ঝলমল, আহা কী আহংকা
তোমারি কেবল!

সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি
নিভে আর জ্বলে হাজার জোনকি
যেন বাঁশবাগানের পাশে ঝাঁকড়া লেবুর তলে।
“নাই নাই, সে ছাড়া কোনো উপাস্য নাই”
নিভে, আবার জ্বলে মনে মনে বলে তাই
এই মহাশূন্য!
শুধু তোমারি, শুধু তোমারই জন্য
এখানে রচিত জীনের মহাকাব্য
এই মর্তে মর্তীয়দের জন্য।

মহাসগরের মানচিত্র হয়েছে আঁকা
মহাদেশগুলো আঁকা বাঁকা
কত মৎসজীবিকা জলতরঙ্গে রয়েছে ঢাকা!
সৈকতে সৈকতে যেন অগণন ফুল ও ফলের ঝাঁকা!

হে মহান, হে সোহান,
আমরা ধন্য, আমরা ধন্য, আমরা ধন্য
তোমার তাবদ সৃষ্টির এই সবলীলতার জন্য।

শিকল হবে শৃঙ্খলিত

আব্দুল্লাহ আল নূমান★

আমি দুঃখী, দুঃখ নেই।
ক্ষুদা নিয়ে কষ্ট নেই।

পাঁচ মুখে অন্ধকার,
তবু হৃদয় নেই আধার।
যদি মাজলুম গর্জে আবার।

চলবে না বিচলিত,
শিকল হবে শৃঙ্খলিত।

দৃঢ় করো হাতে হাত,
যতই আসুক না ঘাত।
পাহাড় ভেঙে দাও প্রতিঘাত।

যুল্‌ম হবে নিপাত,
উঠবে বিজয় –সুপ্রভাত।

আজও ঘুমে শহর রাত,
বিবেকহীন নিঃস্ব প্রভাত।
তবু আলো জ্বলে আশা,
নেভে না সত্যের ভাষা।

যারা সত্যে সৈনিক,
তাদের রূহে আলোর দ্যুতি।
ভয় নয়, বিশ্বাস ঢাল,
তাওয়াক্কুলে নতুন কাল।

উঠো বন্ধু, দাও নামায,
হৃদয় রাখো নির্মল সাজ।
জাগুক আলো ঈমানের পাল,
হক্ব জিতবে, হারবে জাল।

★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

★ *সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ্ সুলতান (রাহিমাহুল্লা-হ) কামিল মাদ্‌রাসা গোদাগাড়ী। বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, তানোর, রাজশাহী।*

★ *আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস সালফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, কোনাপাড়া, ফুরবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ্।*

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল মহোদয়কে সম্মাননা প্রদান

গত ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক (হাফিযাহুল্লাহ) ও ২৮ নভেম্বর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম (হাফিযাহুল্লাহ) ঢাকার জামগড়া-মীরবাড়ি বায়তুল্লাহ জামে মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। খুতবার পর মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক মতবিনিময় শেষে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে নেতৃদ্বয়কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রুপভিত্তিক দা'ওয়াতি কার্যক্রম

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের গ্রুপভিত্তিক দা'ওয়াতি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিগত ৭ নভেম্বর শুক্রবার সদর উপজেলার চোরকোল ইলাকা সফর করেন। নেতৃবৃন্দ তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চোরকোল বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ, চোরকোল নতুন আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও চোরকোল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাদ জুমু'আহ্ চোরকোল ইলাকা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক মুহা. মিকাইল ইসলামের উপস্থাপনায় হাফেয নাবিল বিন মিকাইল ইসলামের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইলাকার সাতটি শাখা হতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহা. মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের খতীব অধ্যাপক মাওলানা ইমদাদুল হক, জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা মুহা. আব্দুস সামাদ, চোরকোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহা. আলাউদ্দীন, চোরকোল ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মুহা. আসগর আলী প্রমুখ। জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পরিচয় তুলে ধরেন এবং জমঈয়তের গৌরবময় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দু'আর মাধ্যমে বাদ 'আসর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১ নভেম্বর শনিবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর উত্তরায় জমজম কনভেনশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। তিনি বলেন, "সবার মাঝে কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে এবং পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া আমানত রক্ষা করতে হবে।"

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম। তিনি মানব কল্যাণে কাজ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পালনে সংগঠনের কর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, আলহাজ্জ মোহাম্মাদ জাকির হোসেন।

এছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইমাম হুসাইন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহা. রেজাউল ইসলাম, তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নূরুল আবসার, মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ, মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুরের অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুন নূর বিন আবু সাঈদ মাদানী, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স, রাজশাহীর অধ্যক্ষ শাইখ ড. মুকাররম বিন মুহসিন মাদানী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সভাপতি শাইখ আব্দুলাহীল হাদী ও সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমাদ প্রমুখ।

সভায় সংগঠনের সাংগঠনিক উন্নয়ন, দা'ওয়াতি কার্যক্রম জোরদারকরণ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নবনির্বাচিত মাননীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলকে ক্রেস্টের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বেরাইদ এলাকা জমঈয়তের সুধী সমাবেশ

গত ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেরাইদের ঐতিহাসিক ভূঁইয়াপাড়া জামে মসজিদে এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শোয়েব ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ তুহিরুল ইসলাম তুহিন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, উত্তর জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী, উত্তর জমঈয়তের সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জনসংযোগ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ মাশহুদুল বাসেত, যুগ্ম সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন মাদানী এবং বেরাইদ এলাকা জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেরাইদ এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি ও মহানগর উত্তর জমঈয়তের প্রশিক্ষণ সম্পাদক শরীফ মাহমুদ।

বেরাইদ এলাকা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ জমঈয়তের নবনির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বাবস্থায় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সাংগঠনিক তৎপরতা

গত ১৪ নভেম্বর শুক্রবার সকাল ১১টায়, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের যৌথ উদ্যোগে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁনের সভাপতিত্বে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ২য় তলায় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি মুহা. সাবিত বিন আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে শুব্বানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচীর উপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা চীপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুহা. মাসুদ আলী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম ও মুহা. ইয়াকুব আলী, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম অধ্যাপক ইমদাদুল হক, জেলা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ মুহা. খালেদ হাসান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক মুহা. মেহেদী হাসান, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক মুহা. তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যকে মুসলিম বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারীর অনবদ্য অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে জমঈয়তের ঐক্য সংহতিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানান ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি। বাদ আসর উপস্থিত মেহমানদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মিরপুর এলাকা জমঈয়তের সুধী সমাবেশ

গত ২৪ অক্টোবর শুক্রবার বাদ মাগরিব মিরপুরের বায়তুল হক্ব মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সাংগঠনিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিরপুর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ ও মসজিদ বায়তুল হক্ব কমপ্লেক্সের সভাপতি ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের সদস্য প্রফেসর শামসুল হক। উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর জমঈয়তের দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ মোহেবুল্লাহ।

এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুরের ভাইস প্রিন্সিপাল ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তালীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নুরুল আবসার, ঢাকা মহানগর উত্তর জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ রায়হান উদ্দিন মাদানী, মাদ্রাসার মুহাদ্দিস শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী, সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমদ প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

১. গাইবান্ধা জেলার মাওলানা আব্দুল মতিন-এর বাবা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আকন্দ (৮২) গত ৭ নভেম্বর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন]। মৃত্যুকালে তিনি ৬ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অনেক আত্মীয় রেখে গেছেন। তার জানাযার সালাতের ইমামতি করেন নিজ পুত্র মাওলানা আব্দুল মতিন। মাইয়্যিতের জন্য দু'আর আবেদন করেছেন গাইবান্ধা জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুস সামাদ আজাদ।

২. দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও শিক্ষাবিদ, সাতক্ষীরা জেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল আলহাজ্জ মাওলানা রফিউদ্দীন আনসারী গত ১৫ নভেম্বর শনিবার বেলা ১২টায় সাতক্ষীরা বাঁকাল মেডিক্যালে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

তিনি মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র মৃত্যুর পর সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জেলার সকল মানুষের নিকট শ্রদ্ধার ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, ড. রবিউল ইসলাম, জামা'আতে ইসলামী সংসদ পদপ্রার্থী মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, অধ্যক্ষ ইজ্জত আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, কলারোয়ার সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হাবিবুল ইসলাম হাবিব, আব্দুর রশিদ চেয়ারম্যানসহ হাজারো আলেমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ, জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত জমঈয়ত দরদী মানুষ তার জানাযায় উপস্থিত হন। চোখের পানি ঝড়িয়ে বিদায় দেন প্রিয় মানুষটিকে, তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন তারই সুযোগ্য বড় ছেলে কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মাওলানা অহিদুজ্জামান আনসারী। তিনি ৩ পুত্র ৬ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা সকলেই তাঁর মাগফিরাত কামনা করি এবং দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন –আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

৩. গাইবান্ধা জেলাধীন কামালের পাড়া এলাকা জমঈয়তের কোষাধক্ষ্য ক্বারী আব্দুস সাত্তার (৮৫) গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন]। তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযায় জমঈয়তসহ এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাইয়্যিতের জন্য দু'আর আবেদন করেছেন গাইবান্ধা জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুস সামাদ আজাদ।

জরুরি আবশ্যক

প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) **মডেল মাদ্রাসা**'র জন্য একজন দক্ষ **হাফেয আবশ্যক**।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।

সেক্রেটারি
প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) **মডেল মাদ্রাসা**
ফতেপুর কাউন্সিল বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর।
☎ ০১৮৯০-৩৩৯৪৩৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বল্লা তাহফীমুল কুরআন ইসলামিয়া মাদ্রাসা'র জন্য একজন **প্রিন্সিপাল** ও একজন **সহকারী শিক্ষক আবশ্যক**।

শিক্ষাগত যোগ্যতা–

⇨ **প্রিন্সিপাল** : দাওরায়ে হাদীসসহ, কামিল/ইসলামিক ষ্ট্যাডিস বা আরবী বিষয়ে অনার্স, মাষ্টার্সসহ দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

⇨ **সহকারী শিক্ষক :** অনার্স বা সমমান (অংক ও ইংরেজী বিষয়ে পারদর্শী)।

বি. দ্র. ১২/১২/২৫ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমু'আহ্ স্বশরীরে বল্লা কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে।

শুব্বান সংবাদ

এসএসসি/আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণায় শুব্বান : জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এসএসসি ও আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর ২০২৫) সকাল ১১টায় রাজধানীর আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফি আল কোরয়াশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ আব্দুল্লাহীল হাদী এবং সঞ্চালনা করেন ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক মো. নাজিবুল্লাহ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্দুল্লাহ আল হাম্মাদ।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসা মোহাম্মদীয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মু'মিন বিন আব্দুল খালিক এবং শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ। বক্তারা বলেন, "কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতির কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অনুপ্রেরণা জোগায়।" তারা শিক্ষার্থীদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, চরিত্র গঠন ও দা'ওয়াতি কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

অংশগ্রহণকারী জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২০ জন কৃতি শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট, ফাইল, বই ও কলম তুলে দেওয়া হয়। এটি ছিল এক অনুপ্রেরণামূলক আয়োজন, যা তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার নতুন উদ্দীপনা ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করবে।

দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

না ফেরার দেশে জমঈয়তের আরেক প্রবীণ কর্মী জনাব আলহাজ্জ আব্দুস শহীদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, গাইবান্ধা জেলা শাখার প্রবীণ দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রিয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির সাবেক সদস্য জনাব আলহাজ্জ আব্দুস শহীদ মিয়া গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার বার্ধক্যজনিত অবস্থায় এশার সালাতের পূর্বে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ৬ ছেলে ৩ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অগণিত শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। তার পিতা মরহুম মৌলভী আব্দুর রহমান; যিনি একাধারে প্রায় ৫০ বছর 'ঐতিহ্যবাহী কুপতলা আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব' ছিলেন।

মরহুম আব্দুস শহীদের নামাযে জানাযায় সর্বস্তরের মুসলিম উপস্থিত হন। বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। সেই সাথে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দ ও অসংখ্য আলেম ওলামা জানাযায় অংশ নেন। লোক সংকুলান বিবেচনায় ও পরিবারের সদস্যদের অনুরোধক্রমে তার ২টি জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের নিজ বাড়ি প্রাঙ্গণে প্রথম জানাযার নামাযে ইমামতি করেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ। দ্বিতীয় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় তারই হাতে গড়া স্কুল 'ধর্মতলা উচ্চ বিদ্যালয়' খেলার মাঠ প্রাঙ্গনে। দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্র, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতি সম্পাদক মো. আব্দুল হাই। মরহুমের মাগফিরাত কামনায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি 'অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম-সহ কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের অনেকেই সমবেদনা জ্ঞাপন ও দু'আ করেন।

উল্লেখ্য যে, আব্দুস শহীদ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি প্রফেসর আল্লামা ড. আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র একান্ত স্নেহভাজন ও আস্থাশীল কর্মী ছিলেন। তিনি সারাজীবন জমঈয়তের একজন একনিষ্ঠ কর্মী বলে নিজের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দু'টি বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য হবার পাশাপাশি মসজিদ, মাদ্‌রাসা, সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মাইয়্যিতের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মাগফিরাত কামনায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সর্বস্তরের দ্বীনি ভাইদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে। (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহু ওয়ার হামহু...)

জানাযায় অংশগ্রহণ করেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যক্ষ (অব.) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. নজরুল হক মঞ্জু, সেক্রেটারি অধ্যাপক মাওলানা আব্দুস সামাদ (আজাদ), কোষাধ্যক্ষ- হাফেয মো. আব্দুস শাফী মিয়া, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মৌলভী মো. আনিছুর রহমান, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্জ মো. মজিবুর রহমান, গাইবান্ধা চেম্বার অফ কর্মাসের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ আব্দুল লতীফ হক্কানী, জেলা শুব্বানের সভাপতি- মাওলানা মো. মতিউর রহমান, কুপতলা আহলে হাদীস মসজিদের সম্মানিত সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, গাইবান্ধা জেলা জামা'আতের আমির ও বর্তমান এমপি পদপ্রার্থী- আলহাজ্জ আব্দুল করিম সরকার, ৩ নং কুপতলা ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম তারা, খোলাহাটি ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মো. মাসুম হক্কানী প্রমুখ।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শরীরে ভিটামিনের অভাব : প্রভাব ও প্রতিকার

ভূমিকা : ভিটামিন হলো এমন অঙ্গসৃষ্টি উপাদান যা আমাদের শরীরের সাধারণ কার্যক্রম বজায় রাখতে অপরিহার্য। এগুলোর অভাবে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও প্রয়োজন মতো সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে এসব সমস্যার প্রতিকার সম্ভব।

ভিটামিন “A”

অভাবের প্রভাব : ভিটামিন “A”-এর অভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমতে পারে, বিশেষ করে রাতে দেখা অন্ধত্বের সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও ত্বক শুষ্ক ও খোসখোসে হয়ে যায় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়।

প্রতিকার : গাজর, কুমড়ো, পেপে, ডিম এবং দুধ ভিটামিন “A”-এর ভালো উৎস। প্রয়োজনে ডাক্তার পরামর্শে ভিটামিন “A” সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিটামিন “B^{1}” (থায়ামিন)

অভাবের প্রভাব : থায়ামিনের অভাবে ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং মনোযোগ কমে যেতে পারে। দীর্ঘ সময়ের অভাব ‘বেরিবেরি’ রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যা পায়ে অসাড়তা এবং হৃদরোগের সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রতিকার : বাদাম, বাদামী ভাত, মাছ এবং শস্যজাতীয় খাবার থায়ামিনের ভালো উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যায়।

ভিটামিন “B^{2}” (রাইবোফ্লাভিন)

অভাবের প্রভাব : ভিটামিন “B^{2}”-এর অভাবে মুখের কোণে ফাটল, জিহ্বা লাল ও ফোলা হয়ে যেতে পারে। চোখের জ্বালা ও শুষ্ক ত্বকও দেখা দেয়।

প্রতিকার : দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজি ও বাদাম রাইবোফ্লাভিনের উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিটামিন “B^{3}” (নিয়াসিন)

অভাবের প্রভাব : নিয়াসিনের অভাবে পেলাগ্রা রোগ হতে পারে, যা ত্বকের র‌্যাশ, মুখ ফোলা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। দুর্বলতা ও হজমে সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকার : মাংস, মাছ, বাদাম এবং শস্যজাতীয় খাবার নিয়াসিনের উৎস। প্রয়োজনমতো সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভিটামিন “B^{6}” (পাইরিডক্সিন)

অভাবের প্রভাব : “B^{6}”-এর অভাবে স্নায়ু সমস্যার কারণে হাত-পায়ে জ্বালা এবং অসাড়তা দেখা দেয়। ত্বকের সমস্যা, অনিদ্রা এবং ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

প্রতিকার : মসুর ডাল, বাদাম, মাছ এবং কলা “B^{6}”-এর ভালো উৎস। প্রয়োজনে ডাক্তার পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভিটামিন “B^{12}”

অভাবের প্রভাব : “B^{12}”-এর অভাবে রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) দেখা দেয়। স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যা যেমন হাত-পায়ে অসাড়তা ও চলাফেরায় অসুবিধাও হতে পারে। স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে।

প্রতিকার : মাছ, মাংস, ডিম এবং দুগ্ধজাত খাবার “B^{12}”-এর প্রধান উৎস। প্রয়োজনে ইনজেকশন বা সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

ভিটামিন “C”

অভাবের প্রভাব : “C” ভিটামিনের অভাবে স্কারভি রোগ দেখা দেয়, যার ফলে দাঁতের সমস্যা, রক্তপাত এবং জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং ত্বকের ক্ষয় হয়।

প্রতিকার : লেবু, কমলা, অমলা এবং সবুজ শাকসবজি ভিটামিন “C”-এর ভালো উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিটামিন “D”

অভাবের প্রভাব : “D” ভিটামিনের অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে যায়। শিশুদের মধ্যে রিকেটস এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অস্টিওম্যালেসিয়া হতে পারে। পেশী দুর্বলতা দেখা দেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট সূর্যের আলো গ্রহণ, দুধ, ডিম এবং চর্বিযুক্ত মাছ “D” ভিটামিনের উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

ভিটামিন “E”

অভাবের প্রভাব : “E” ভিটামিনের অভাবে পেশী ও স্নায়ুর দুর্বলতা এবং দৃষ্টিশক্তি সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকার : বাদাম, তেল এবং সবুজ শাকসবজি “E” ভিটামিনের উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

ভিটামিন “K”

অভাবের প্রভাব : “K” ভিটামিনের অভাবে রক্ত জমে না যাওয়া, রক্তপাত বৃদ্ধি এবং হাড় দুর্বল হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকার : সবুজ শাকসবজি যেমন স্পিনাচ ও ব্রোকলি, মটরশুঁটি ভিটামিন “K”-এর ভালো উৎস। প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা যায়।

উপসংহার : ভিটামিনের অভাব দীর্ঘমেয়াদে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সুষম ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো এড়ানো সম্ভব। নিয়মিত ডাক্তার বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস এবং সাপ্লিমেন্ট পরিকল্পনা করা উচিত।

সূচীপত্র

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ইসমে আযমের দু'আ কোনটি এবং ফযীলত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

ফারহানা আক্তার, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : ইসমে আযম অর্থাৎ- "অধিক মহান নাম"-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলার সকল নামই সুন্দর ও মহান, তবে কোন্‌টি অধিক মহান এ বিষয়ে একাধিক বক্তব্য রয়েছে যা নিম্নরূপ *(আসমাউল্লাহিল হুসনা ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ- ১/১৯৭-২০৫ পৃ.) :*

(ক) অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন "الله" নামটি ইসমে আযম। অতএব "الله" নাম দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। **(খ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الرمن الرحيم"। **(গ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الحي القيوم"। **(ঘ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الأحد الصَّمَدُ"।

এ মর্মে কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আসমা বিনতু ইয়াযীদ নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইসমে আযম ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ এবং সূরা আ-লি 'ইমরান-এর শুরু ﴿الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ এ দু'টি আয়াতে রয়েছে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৪৯৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫৫, সহীহ)*

সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন : ইসমে আযম, যার মাধ্যমে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। সে ইসমে আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। তাবেঈয়ী আল কাসিম বলেন : আমি সূরাগুলোতে খুঁজে পেলাম। সূরা আল বাক্বারাহ্, ২৫৫ নং আয়াত– ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾। সূরা আ-লি 'ইমরান, ২ নং আয়াত– ﴿الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾। সূরা ত্ব-হা-, ১১১ নং আয়াত– ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾। অর্থাৎ- ইসমে আযম "الحي القيوم"। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩২৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৪৬; সহীহাহ্- হা. ৭৪৬)*

বুরাইদাহ্ আসলামী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা দু'আ করতে শুনেছেন, «اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ أَنِّىْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اْلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

অতঃপর বলেন : আল্লাহর কসম করে বলছি! সে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আযম অধিক মহান নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছে। এটা এমন নাম যার মাধ্যমে দু'আ করলে কবুল হয় এবং কিছু চাইলে পাওয়া যায়। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩৪১, মা. শা., হা. ১৪৯৩, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫৭)*

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় "ইসমে আযম" একাধিক হতে পারে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : কোন কোন 'আলেম খুতবাহ্ বা বক্তব্যের মাঝে চিৎকার করে বলেন, "বলুন : ঠিক, না বেঠিক" –এরূপ বলা শরীয়তসম্মত কি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি এরূপ বলতেন। *মুবারক সুমন, ডেমরা, ঢাকা।*

জবাব : জুমু'আর খুতবাহ্ সাধারণ বক্তব্য বা ওয়াজ মাহফিলের মতো নয়; বরং এর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধি-নিষেধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খুতবাহ্ প্রদানের সময় একটা আলাদা ভাব-ইমেজ থাকত। এতে শ্রোতারা ইচ্ছামত কথা বলা বা কোনো কাজ করার সুযোগ রাখে না। *(বুখারী- ৮৮৩; মুসলিম- ৮৫৭)*

যদিও খুতবাহ্ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে খত্বীব সাহেব কাউকে কোনো জিজ্ঞাসা বা কারো প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মাহফিলের মতো পরিস্থিতি বানাতে পারেন না। অবশ্যই খুতবার বৈশিষ্ট্য ও ভাব বজায় রাখতে হবে।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মে খত্বীব সাহেবের প্রশ্ন করা এবং এর জবাবে মুসল্লিদের ঠিক ঠিক বলে উত্তর দেওয়া অনুচিত। ☒

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ইবনে তুলুন মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

কায়রোর কোলাহলময় শহরের মাঝেই নিঃশব্দে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইবনে তুলুন মসজিদ। এটি মিশরের ইসলামী ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার এক জীবন্ত দলিল। সাদামাটা বাহ্যিক রূপের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে ইসলামী স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন, যা দর্শককে অতীতের ধ্বনিতে প্রবেশ করায়। ৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ‘আব্বাসীয় গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন মসজিদটি নির্মাণ করেন, যা আজও মিশরের অন্যতম প্রাচীন এবং সবচেয়ে সুসংরক্ষিত মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত।

ইরাকের সামারার স্থাপত্যশৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত এই মসজিদটি ধ্রুপদী ‘আব্বাসীয় শিল্পকলা ও গঠনশৈলীর এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রীকরণ এই মসজিদকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। ইবনে তুলুন মসজিদটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন রাজধানী আল-কাতা'ই শহরের কেন্দ্রীয় জামা‘আত মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। স্থানটি নির্বাচিত হয়েছিল গেবেল ইয়াশকুর বা থ্যাঙ্কসগিভিং পাহাড়-এর ওপর। আহমদ ইবনে তুলুন মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ দরজা ব্যবহার করতেন। এই দরজাটি আজও কিবলা দেয়ালের পাশে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্থাপত্যগত দিক থেকে মসজিদটি বিস্ময়করভাবে সুবিশাল এবং সুপরিকল্পিত। এর চারপাশে রয়েছে জিয়াদা বা বাহিরের ঘের যা মসজিদকে শহরের কোলাহল থেকে আলাদা রাখার পাশাপাশি ওযূ ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করত। বিস্তৃত খোলা সাহন বা উঠানকে ঘিরে রয়েছে সারি সারি খিলানযুক্ত ছায়াময় রিওয়াক যা ইট, কাঠ ও স্টুকোর নিপুণ ব্যবহার দ্বারা সজ্জিত। কিবলামুখী অংশে রয়েছে পাঁচটি আইল বিশিষ্ট বৃহৎ ‘ইবাদত কক্ষ। ‘ইবাদত কক্ষে কাঠের শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ মিম্বার এবং সুলতান লাজিন কর্তৃক নির্মিত গম্বুজ যুক্ত কিয়স্ক আজও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। মসজিদের বহিরাগত সর্পিল সিঁড়ি-সংবলিত মিনারটি মধ্যপ্রাচ্যের স্থপত্য নকশার এক বিরল দৃষ্টান্ত।

‘আব্বাসীয় শাসন শেষে ফাতেমীয় ও মামলুক আমলে মসজিদে বহু সংস্কার ও সংযোজন করা হয়। বিশেষভাবে বলা যায় সুলতান লাজিনের সংস্কার মসজিদটিকে পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। তিনি শুধুমাত্র মসজিদের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো সংস্কার করেই থেমে যাননি; বরং নতুন কাঠের মিম্বার, গম্বুজ এবং ঝর্ণা নির্মাণের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তবে মধ্যযুগের পর দীর্ঘসময় মসজিদটি উপেক্ষিত ছিল। কখনো এটি সামরিক হাসপাতাল, কখনো লবণের গুদাম, আর কখনো আশ্রম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৯ শতকে বহু খিলান ভেঙে পড়ে এবং স্থাপত্যের মূল সৌন্দর্য নষ্ট হতে থাকে। অবশেষে সংরক্ষণ কমিটি এবং মিশরীয় সরকারের উদ্যোগে ২০ শতকে বৃহৎ পরিসরে পুনরুদ্ধার শুরু হয়। ২০০২-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের সর্বশেষ সংস্কারে পুরো উঠান পাথর দ্বারা পাকা করা হলেও কিছু বিশেষজ্ঞ এর সমালোচনা করেছেন, কারণ এতে দেয়ালে আর্দ্রতা জমার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

আজকের দিনে ইবনে তুলুন মসজিদ শুধু একটি প্রার্থনাস্থল নয়; বরং ইসলামী ঐতিহ্য, প্রাচীন কারিগরি দক্ষতা এবং ইতিহাসের গভীর শেকড় সম্বলিত এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক নিদর্শন। শত শত বছরের ধ্বংস, আগুন, অবহেলা, রাজনীতি এবং পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে টিকে থাকা এই মসজিদ কায়রোর বুকে মুসলিম সভ্যতার এক অবিচল প্রতীক হিসেবে আজও নিজের স্থান ধরে রেখেছে।

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে
Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

Electrical Machine Lab

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

Library

Computer Lab

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

Permanent Campus

☎ 01329-728375-78 ✉ info@iiustb.ac.bd f /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং**
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice